স্মৃতিময় একাত্তর

স্মৃতিময় একাত্তর

শেফালী দাস

স্মৃতিময় একাত্তর
শেফালী দাস
প্রকাশকাল : জুলাই-২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. আশরাফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০০ (তিনশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৯৮-১-০
ISBN: 978-984-96898-1-0

Sritrimoy Akattor By Sefali Das, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.; Date of Publication: July -2024; Copy Right:Writer; Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Ashraful Islam, Chayyanir Computer; Price: 300/- (Three Hundred Taka Only);
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : ০১৬১১-৯১৩২১৪

উৎসর্গ

নয়মাস রক্তক্ষয়ী
সংগ্রামের মাধ্যমে যাঁরা
সোনার বাংলা উপহার দিয়েছেন

১ম পর্ব

১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে সারা পূর্বপাকিস্তানে রাজনীতির অঙ্গন উত্তাল। প্রতিদিনই লাগাতার নানা রকম প্রোগ্রাম চলছেই। আজ হরতাল, কাল সভা বিক্ষোভ প্রতিদিনই আছে। আমি তখন জামালপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকার পদে চাকরিরত। কলেজ জীবন থেকে রাজনীতির একটা নেশা ও রাজনীতি করার অভ্যাসও ছিল। নানা রকম স্লোগান দেওয়া, মিটিং মিছিলে যোগদান করার অভ্যাসও ছিল কিন্তু সাংসারিক অসুবিধার জন্য সেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। তবুও প্রগতিশীল রাজনীতির প্রতি একটা আলাদা টান ও আগ্রহ বরাবর ছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংসদ উদ্বোধন নিয়ে নানা টালবাহানা করছে। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করতে জনগণ আরও বিক্ষুব্ধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর উপস্থিতিতে 'আমার সোনার বাংলা' গানের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হলো। ৭ মার্চ রবিবার অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ক্লাস বর্জন করে আমি টাঙ্গাইল চলে আসি, আর রেডিও শুনতে লাগলাম। আমাদের নেতা বঙ্গবাসীর জন্য কি ভাষণ দেন আর বর্বর পাকিস্তানিরা কখন কি ফতোয়া জারি করে। প্রতিউত্তরে বঙ্গবন্ধুও বাঘের মত গর্জে উঠতে লাগল। বঙ্গবন্ধুও তার সংগ্রামের সোনার বাংলাকে বাঁচাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন।

২৫ শে মার্চ রাতের অন্ধকারে হানাদার বাহিনী ৭ কোটি বাঙালির স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করার জন্য অতর্কিতে রাজারবাগ আক্রমণ করে কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই। শুধু পুলিশ নয়, ছাত্রজনতা কাউকেই ওরা ছাড়েনি। বঙ্গবন্ধুর চুপ করে থাকার আর কোন উপায় ছিল না। বাধ্য হয়েই দেশের এরূপ পরিস্থিতিতে জনগণের মুখের দিকে চেয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। প্রতিরোধ দিবসের পর সবাইকে কেমন যেন এক কালো ছায়া ঘিরে রেখেছে। ইয়াহিয়া, মুজির ভুট্টোর বৈঠক থেকে সমাধানের তেমন কোন খবরই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন প্রেসিডেন্ট ভবনে আলোচনা করতে যাচ্ছেন কালো পতাকা উড়িয়ে সাদা গাড়িতে করে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলছেন, আলোচনা এগুচ্ছে। ওদিকে আন্দোলনকারী জনতাকে বলছেন সংগ্রাম চালিয়ে যান। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে। ২৬ শে মার্চ আমরা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রেডিও চালিয়ে দেখি রেডিও বন্ধ, ঢাকায় আত্মীয় স্বজনদের কাছে ফোন করতে গেলাম কিন্তু ফোন ডেড। একটু বেলা হতেই ঢাকা থেকে বেশ কিছু লোক পায়ে হেঁটে টাঙ্গাইল এসে পৌঁছেছে। তাদের কাছ থেকেই শুনতে পেলাম ইয়াহিয়া খানের নানা রকম নিমক হারামীর কথা। অনেকেই বলাবলি করছিল আলোচনার নামে অযথা কালক্ষেপণ করে ছদ্মবেশে আর্মি এনে বাংলায় জড়ো করছে। যাতে কোন কিছুতেই বাঙালি সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

রেডিও খুলেই শোনা গেল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে কারফিউ জারী করেছে, ঢাকায় যে সব তাণ্ডবলীলা পাক সরকার চালাচ্ছে। গোলাগুলির বিকট আওয়াজ শুনতে শুনতে ঢাকার লোক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নানা দিকে ছুটে ছড়িয়ে পড়েছে। সকালে রওনা দিয়ে বিকেলে, দুপুরে রওনা দিয়ে রাত্রিতে একইভাবে অনেক লোক টাঙ্গাইল এসে পৌঁছেছে। ওদের তাণ্ডব দেখে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মিলিটারি সরকার অতি শীঘ্রই টাঙ্গাইল আসবে। অজানা আতঙ্কে সবাই দিশেহারা ও বুদ্ধি হারা হয়ে পড়েছে। এখন কি করবে, কীভাবে প্রাণ বাঁচাবে সে চিন্তায় সবাই উদ্বিগ্ন।

২য় পর্ব

২৭ শে মার্চ ১৯৭১, শনিবার সকালে দেখি ঢাকা থেকে অনেক লোক টাঙ্গাইল এসে পৌঁছেছে। আমাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের কাছে শোনা লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের কথা, রাজারবাগে গোলাগুলি ও তার আশপাশেও ছড়িয়ে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে গোলাগুলির আওয়াজ, আরও এলাকার শুধু নয় অন্যান্য এলাকার লোকেরাও ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বের হয়ে এসেছে। লোকের মুখে নানা রকম কথা শুনে মা বাবাতো ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল, আমাদের তেমন কোন শক্ত সামর্থ্য অভিভাবক নেই, ভাইগুলো ছোট। আমরা তিন বোনই ভাইদের ও মা-বাবার অভিভাবক। কি করে কি করবো? আমরা নিজেরা বাঁচবো?- না ওদেরকে বাঁচাবো? আমার বড় কমলদি, সে বলল, নিজেরা আগে বাঁচি তারপর ওদের চিন্তা করব। আমি বললাম, না। বাঁচি যদি একসঙ্গে বাঁচবো। আর মরলেও এক সঙ্গেই মরবো। কমলদি জোর দিয়ে বলল, না তা হবে না আমরাও বাঁচবো, ওদেরকেও বাঁচিয়ে রাখবো।

বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক, হীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী আমাদের পাশের বাসায় থাকতেন। উনার মেজো মেয়ের জামাই ধনী ও জনদরদী ছিলেন। উনি ঢাকা স্বামীবাগে শক্তি ঔষধালয়ের পরিচালক। উনিও ২৬ শে মার্চ চলে এসেছেন উনার বাড়ি হিঙ্গানগরে। আমাদের প্রতিবেশী মাস্টার বাবুকে আমরা কাকা বলে ডাকতাম। ২৭ শে মার্চ উনারা একটা ট্রাকে করে হিঙ্গানগরের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের তো যাওয়ার কোন জায়গা নেই তাই উনাকে যেয়ে বললাম, কাকা আপনাদের সঙ্গে আমাদের নিবেন? কাকা কাকিমাকে বললেন, শুনতে পাচ্ছ, শেফুরা কি বলছে? কাকিমা একটু রুষ্ট হয়ে বললেন, কি করে সম্ভব, আমরা যাচ্ছি মেয়ের শ্বশুরবাড়ি, আর এ ঝামেলা কতদিনে মিটবে, কিংবা আদৌ মিটবে কিনা কিছুই তো জানিনা। আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি কিছু মনে করে? চট করে কমলদি বলে উঠল, না না কাকিমা, আমরা হিঙ্গানগর যাবো না, আমরা গমজানীতে নামবো। ঐ রাস্তার ধারে স্কুলের সামনে আমাদের নামিয়ে দিবেন। আমাদের আত্মীয় বাড়ি আছে, ওখানে যাবো। কাকিমার মুখ দেখে মনে হলো, উনি যেন কিছুটা দুশ্চিন্তা মুক্ত হলেন। এই দুর্দিনে তিনখানা সোমত্ত মেয়ের দায়িত্ব কে নিতে চায়?

টাঙ্গাইল থেকে সকালের নাস্তা খেয়ে তিনবোন ১০ টার দিকে গমজানীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাড়িতে রইল মা-বাবা ও ছোট তিন ভাই। তিন ভাই-এর মধ্যে বড় বিমান। সে আই.এ. পাশ করে করটিয়া সা'দত কলেজে বাংলায় অনার্স ১ম বর্ষে পড়ছে। আর ছোট দুজন বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণিতে পড়ে, মা-বাবার উপর ওদের পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে আমরা চলে গেলাম গমজানী। ওখানে পৌঁছানোর পর আমাদের আত্মীয় ও আমার বান্ধবী ইতি আমাদের সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে গেল। আর বলতে লাগল, তোমরা আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি।

ইতিরা আমাদের কয়েক রকমের আত্মীয়। মায়ের দিকে, বাবার দিকেও তাছাড়া ইতি যখন বিন্দুবাসিনী গার্লস স্কুলে হোটেলে থেকে পড়ত তখন বাবা ওর লোকাল গার্জিয়ান ছিল এবং সেই সুবাদে আমাদের বাড়িতে আসতে থাকতো। তাছাড়া ইতি খুব ভাল মেয়ে ছিল, চেহারাটাও বেশ সুন্দর। আমি ইতির সঙ্গে সরিষাবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একসঙ্গে একবছর শিক্ষকতা করেছি এবং দু'জনে হোটেলে একই রুমে থেকেছি। তাই অন্তরঙ্গতাও দুজনের মধ্যে প্রচুর। ইতির বাড়িতে ইতির মা ও ছোট ভাই এবং পাশের বাড়িতে ইতির জ্যাঠাত ভাই খগেনদা, তার স্ত্রী ও মা এবং দু' ছেলে মেয়ে। ওরা সবাই প্রয়োজনে আমাদের বাড়িতে যায়, তাই ওদের সঙ্গেও আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছে।

৩য় পর্ব

গমজানীতে প্রতিদিন টাঙ্গাইলের নানা খবর পাচ্ছি, নাটিয়াপাড়ায় পাক বাহিনীর আসার পথে বেরিকেড দিয়েছিল টাঙ্গাইলবাসী। সুশিক্ষিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর কাছে কি করে সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালিরা পারবে। ওদের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে মান্ধাতার আমলের পুরোনো অস্ত্র কতক্ষণ চলবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিদের সেদিন পিছু হটে আসতে হয়েছে। মিলিটারি টাঙ্গাইল শহরে ঢুকে শহরকে তছনছ করে দিচ্ছে। ক্লাব রোডে খোকন ঘোষ নামে এক লোককে এসেই হত্যা করেছে এবং তার ভাগ্নেকে গুলি করেছে। শুনতে পেলাম ছেলেটার হাতে গুলি লেগেছে তাই সে বেঁচে আছে। মা ভাইদের নিয়ে গ্রামের বাড়ি ঘারিন্দা গিয়েছে, তাই ভয় একটু কম। আট-দশদিনের মত গমজানী গ্রামে ইতিদের বাড়িতে আছি, আমাদেরও খুব লজ্জা লজ্জা লাগছে। শেষ পর্যন্ত আমরা স্থির করলাম, কপালে যাই থাকুক বাড়ি চলে যাব। কমলদি আমাদের কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে নিল। আমরা ইতির মা ও ইতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে পথে নামলাম, ওরা সঙ্গে কামলা গোছের একটা লোক দিয়েছিল। পথে এগিয়ে দিয়ে আসবে। খানিকদূর আসার পর আমরা ওকে বললাম, ভাই তুমি ফিরে যাও, অযথা তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

আমরা তিন বোন রাস্তা না চিনে বাড়ির দিকে হাঁটছি। রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তারাই নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে। আবার ভয়ও দেখাচ্ছে, ওদের ডরভয় নেই, তিনটা মেয়ে কীভাবে, কোন ভরসায় চলছে। কথা না বলে আমরা চুপচাপ এগিয়ে এসেছি। লোকজনদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে দেখলাম সুসজ্জিত শ্মশান। চৈত্র মাসের খরতাপে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শ্মশানে একটা গাছের নিচে বসে পড়লাম। কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে কৈজুরীর শ্মশান ছেড়ে আমরা এগুতে লাগলাম। তারটিয়া, হাতিলা, আউলটিয়া হয়ে ঘারিন্দা বাজার দিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। বাড়িতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মা কাছে এসে বলল, আমার মেয়েরা চৈত্রের প্রখর রোদে কালো হয়ে গেছে। দুঃখের মধ্যেও আমি হেসে বললাম, তোমার মেয়েরা কবে ফর্সা ছিল। এত ক্লান্ত লাগছে যে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। ভাইপো-ভাইঝি দৌড়ে এসে পিসীদের ঘিরে দাঁড়াল।

৪র্থ পর্ব

প্রতাপলোচন সরকার আমার বড়দা। শিবনাথ স্কুলের শিক্ষক, তার মেয়ে অঞ্জলী খুবই কাজের মেয়ে। সে এসে বলল, শেফু পিসী কুয়ো থেকে স্নানের জল তুলে দিয়েছি, স্নান করে নাও ভাল লাগবে। আর হাতে একগ্লাস জল খেতে দিল। আর এক ভাইপো স্বপন, সে এসে আমার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। ছেলেটা প্রাইমারিতে পড়ে, খুবই আদর প্রিয়। ওকে দেখে যদি কথা না বলি, তাতেই ওর অভিমান হয়ে গেল। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সব ভাতিজা-ভাতিজি ও নাতি-নাতনীরা এসে আমাদের খাওয়ার ঘরে আড্ডা জমাতো। আমাদের দেখে বাড়ির ছোটরা খুবই খুশি আর বাড়ির বড়রা আমাদের দেখে খুবই চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তাদের কিছুই করার নেই।

চারিদিক থেকে নানা রকম কথা শুনে মা আমাদের নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমাদের কোথায় রাখবে, কি করবে এ ভাবনায় মা সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকত। বাবা টাঙ্গাইলের বাসায় থাকত। আর মা এই দুর্যোগের সময় ভাই-বোনদের নিয়ে ঘারিন্দার বাড়িতে থাকত। ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার সাবালিয়াতে পাক সেনারা হিন্দুবাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখা ঘারিন্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওটা দেখে আমরা আরও দুশ্চিন্তায় পড়লাম। মে মাস শুরু হয়েছে, গাছে গাছে আমের গায়ে রঙ ধরেছে কয়েকদিন পরেই আম পাকবে। এত আমগাছ, এত আম এর আগে আমরা কোনদিনও দেখিনি। মাও ভাবছে, আমার ছেলে-মেয়েরা গাছ থেকে ডাশা আম পেড়ে এমন আনন্দ করে কোনদিন খায়নি। ওদের আনন্দ

দেখে মাও খুব খুশি। গঙ্গা, তুলসী, খড়্গ, স্বপন ডাশা আম এনে আমার হাতে দিত। আমি বটি দিয়ে কেটে গামলা ভর্তি করে উঠোনে বসে সবাই একসঙ্গে মজা করে খেতাম। এমন মজা আগে কখনও পাইনি।

৫ম পর্ব

এ সমস্ত আনন্দময় দিনগুলোর মধ্যে একদিন ভোরে মা আমাদের চিৎকার করে ডাকতে লাগল। বাড়ি যখনই যেতাম আমি বড়মার ঘরে বড়মার কাছে রাতে ঘুমোতাম। এক সঙ্গে বড় বড় তিনখানা শালকাঠের চৌকি পাতা, তাতে ঢালা বিছানা পাতা, সাদা ধবধবে ফরাস বিছানো থাকতো। এটা আমাদের বাপ-জ্যাঠাদের পছন্দের বিছানা। হঠাৎ করেই চিৎকার হট্টগোল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার পাশে শুয়েছিল অঞ্জলী। ধড়ফড় করে উঠে আমার হাত ধরে টানতে লাগল আর কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে আমাকে বলল, ও পিসী তাড়াতাড়ি ওঠ, বাড়িতে মিলিটারি এসেছে এখন কি হবে? আমি বললাম, চুপ কর, একটা কিছু হবেই, আমার হাত ধরে থাক ঘর থেকে বের হয়ে দেখি রাজাকার বাহিনীও আমাদের উঠোনো দাঁড়িয়ে আছে। মা চিৎকার করে সবাইকে ডেকে বলছে, ঐ তোরা তাড়াতাড়ি ওঠরে, সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। সমস্ত গ্রাম মিলিটারিরা ঘিরে ফেলেছে। যে যেখানে পারিস তাড়াতাড়ি পালা। আমরাও যেদিক থেকে বাড়ি হতে বের হতে চাই সেদিকেই পাক সেনা। আমরা বাধ্য হয়ে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ৮০ বছর বয়সের বৃদ্ধ পেনশন ভোগী আমার জ্যাঠামহাশয় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে বললেন, বাড়ির পিছন দিকটা ফাঁকা, ওখানে কেউ নেই। দৌড়ে তাড়াতাড়ি পালা। আমিও কালবিলম্ব না করে বাড়ির পিছনের ঝোঁপের মধ্যে অঞ্জলী ও বাকালীবাড়ির মালাকে নিয়ে পালালাম।

এমন একটা জায়গায় ঢুকেছি যেটা বেতঝাড়। গায়ে, মাথায় এমনকি বেতের কাটার খোঁচায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। উঃ করারও উপায় নেই, একটু যে সরে দাঁড়াব সেটাও সম্ভব নয়, পাশেই কাঁচা পায়খানা দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ওখানে আর থাকতে না পেরে চুপিচুপি মেয়েদের বললাম, তোরা তাড়াতাড়ি নিশ্চুপে সরে যা। একটু পরে দেখি পাক হানাদার বাহিনী কেউ নেই, ভাবলাম এই সুযোগে পালাবো। কিন্তু কি করবো এক হিন্দু ভোলা সুতারের ছেলে আমার পিছু নিয়েছে, আমি যেদিকে যাই ছেলেটা সেদিকেই যায়, ছেলেটি কি বুঝেছে, আমাকে বারবার বেরিকেড দিচ্ছে কেন? তখন আমার শরীরে লুকানো ছিল ২০ ভরি সোনা।

মাকে বললাম, মা ও আমার কাছে কি চায়। ওকে ধমক দিয়ে বললাম, গেলি? যদি না যাস, তাহলে কিন্তু পরে মজা বুঝবি, এই দিন, দিন নয়, আরও দিন আছে। ধমক খেয়ে ছেলেটা সত্যিই সরে গেল। আমিও সোনাগুলো লুকিয়ে রাখলাম, জ্যাঠামহাশয় আমাদের আবার দেখতে পেয়ে ধমক দিয়ে বললেন, এখনও তোরা যাসনি। কমলদি আমার, অঞ্জলী ও সোনালীর হাত ধরে নিয়ে বাড়ি থেকে এমন দৌড় দিলো আমরা এক দৌড়ে আগবেথুর বিজয় গোসাই-এর বাড়ি গিয়ে উঠেছি, পিছনে তাকানোর কোন অবকাশ পাইনি। বিজয় গোসাই-এর বাড়ির এক বৌ (গোসাইয়ের পালক ছেলের বৌ) নাম সম্ভবত মায়া আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, এখানে আসবে না চলে যাও। আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। পরে শুনেছি যে আমাকে বকেছিল এবং ধাক্কা দিয়েছিল, সে বৌটি আমাদের মামার বাড়ির আত্মীয়। কমলদিতো ভয়ানক রুষ্ট হলো। কি করবে আর আমরা যে ভয়ানক অসহায়। ৪টি মেয়ে খালি হাতে রাস্তায় নেমেছি, ইজ্জত ও প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। এবার আমাদের তিনজনকে নিয়ে কমলদি ভীষণ বিপদে পড়ল।

কমলদি আমাদের নিয়ে রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে বসে পড়ল। রাস্তায় বসে বসে চিন্তা করে কমলদি বলল, চল, ঈশ্বর কপালে যা রেখেছে তাই হবে, লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে যাবো। এবারও কমলদি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে লাগল, আমাদের সাহস ও ভরসা দিতে লাগল। আমরা দুপুরের দিকে ধলাপাড়া পৌঁছলাম। আমাদের মন তো অস্থির-তিন ভাই ও মাকে প্রায় মিলিটারির থাবার মুখে রেখে নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য চলে এসেছি। বাড়ির সবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। আবার এ কথাও ভাবছি আমাদের জন্য ধলাপাড়ায় আমাদের বিয়াইন পুতুরা এদের তো অশান্তি দিতে পারি না। ধলাপাড়ার গণেশ দত্ত আমার বিয়াই এবং তার ছেলে বিমল দত্ত ভাইঝি জামাই এবং কমল দি ও পুতুরা এরাও ঘারিন্দার সংবাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। যতই দুঃখ কষ্ট শোক আসুক না, খেতে তো হবেই। পেট তো কোন অজুহাত মানবে না, তাই কিছু খেতেই হলো। দত্তবাড়ির লোকরাও খবরাখবর নিতে চেষ্টা করছে। সন্ধ্যার দিকে গ্রামের কোন একজন লোক এসে খবর দিল সরকারবাড়ি (আমাদের বাড়ি), বাকালী বাড়িতে পাকসেনারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সরকার বাড়ির কোন লোক আহত হয়নি। বসাক বাড়ির দু'টো ছেলে, মজুমদার বাড়ির বীরেশ মজুমদার ও তার ছোট ছেলেকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে। পুড়িয়ে দেওয়া মানে সর্বস্বান্ত করা। চুরিডাকাতি হলে তবুওতো কিছু থাকে। পুড়িয়ে দিলে তো সব ছাই হয়ে যায়। এ সংবাদ শুনে আমরা কাঁদতে আরম্ভ করলাম। সেদিনও কমলদি মায়ের মত করে আমাদের কাঁদতে দেয়নি। আমাদের বুকের মধ্যে জাপটে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বলল, তোর না কত সাহস আর ধৈর্যও তো আছে। এখন এমন করছিস কেন? আমার বোনেরা তো অবুঝ নয়। তুই না বাবাকে দুঃখ না করার জন্য কত সান্ত্বনা দিতিস। সোনার বোন আমার শক্ত হ দেখি।

৬ষ্ঠ পর্ব

ধলাপাড়ায় আমাদের আত্মীয়রা যথেষ্ট যত্ন সহকারেই তাদের বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিল। দত্তরা সত্যিই ভদ্র। ওখানেও আমাদের ঠাঁই দীর্ঘস্থায়ী হলো না। চার/পাঁচদিন থাকার পর শুনলাম দু'একদিনের মধ্যে ওখানে মিলিটারি আসবে। তাই ভাবলাম বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে না থাকাই ভাল। আমরা চারজন মেয়ে কমলদির নেতৃত্বে ওখান থেকে এলাম চাকলান, কালিহাতি থানার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ওখানে আমার জ্যাঠাত বোন দীপ্তির বিয়ে হয়েছে দেববাড়ির ছেলে তরুনকান্তি দেব (ভানু) এর সঙ্গে। আমরা ৪ জন আবার গিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হলাম। খুব লজ্জা লাগছিল, কেমন করে দিনের পর দিন আত্মীয়ের বাড়ি থাকবো। ওখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিদি জামাইবাবু ও মাঐমা আমাদের আদর করে বাড়ি নিয়ে গেল। মাঐমা বলতে লাগল, যুদ্ধ লাগল বলেই তো তোমরা আমাদের বাড়ি এলে। তা না হলে তো এদিকে তোমাদের আসাই হতো না। ঈশ্বর যখন এনে দিয়েছে তখন তোমার গরীব মাঐমার কাছে কিছুদিন থেকে যাও।

তাই কি থাকা হয়। প্রতিদিনই কিছু না কিছু দুর্ঘটনার কথা কানে আসে, আর নিদারুণ ভয়ভীতিতে দিন কাটছে। একদিন খবর এলো শিবনাথ স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক কান্তি রায়কে মিলিটারি ধরে নিয়ে গেছে। এই রকম অপ্রীতিকর কত ঘটনাই রাজাকার ও মিলিটারিরা নির্বিবাদে ঘটিয়ে চলছে। এদিকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীও বসে নেই। তারাও দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিচ্ছে দেশব্যাপী-যেমন অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে আবার ইন্ডিয়াতেও প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তি বাহিনীতে জীবন ত্যাগ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সারা বাংলাদেশের সবখানেই রাজাকারের অত্যাচার ও মিলিটারির নিষ্পেষণ লেগেই আছে। কোনখানেও শান্তি নেই, কোথায় যাবো একথা ভাবতে ভাবতে মনে হলো আমরা গ্রামের বাড়ি ঘারিন্দায় ফিরে যাবো। এভাবে পরের বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করা বা অন্যের বাড়ি থাকা কাহাতক আর সহ্য করা যায়। তাই আমরা আবার জুন মাসের শেষের দিকে ঘারিন্দায় আমাদের বাড়িতে ফিরে এলাম। এখানে এসেও কিছুতেই ঠিক থাকতে পারছি না। মনটা নানা বিষয়ে খুবই উদ্বেগপূর্ণ থাকে। ছোট ভাইদের কীভাবে নিরাপদে রাখা যায় সে চিন্তায় আমরা বোনরা সর্বদা অস্থির থাকি।

৭ম পর্ব

বাড়িতে কয়দিন থেকে ঠিক করলাম আমি আমার কর্মস্থল জামালপুরেই চলে যাবো। আমরা ৪ জন মেয়ে আর ছোট দুই ভাই যাবো কিন্তু কমলদি কিছুতেই রাজী হলেন না। বলল, মা-বাবাকে দেখবে কে? মা-বাবাকে ফেলে রেখে আমি যেতে পারব না, তুই ওদের নিয়ে যা, না হলে একাই যা। আমি বললাম, একা কি করে যাবো? একা যাওয়া সম্ভব নয়।

গ্রীষ্মকাল। গ্রামের বাড়িতে আমরা থাকছি। ভাইবোন ভাতিজা-ভাতিজি সব এক সঙ্গে থাকছি। একত্র খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা, গল্প করা, বইপড়া। এগুলো নিয়ে হইচই করে দিন কাটিয়ে দেই, আমাদের বাড়ির পূর্বপাশে বাকালী বাড়ি, উত্তরপাশে সুতার বাড়ি, পুকুর পারে কর্মকার বাড়ি। এখানে বসাকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আগে থেকেই আমাদের একটা রেওয়াজ ছিল যে সুতারবাড়ি বাকালীবাড়ি, তাঁতিবাড়ি, নাপিতবাড়ি ইত্যাদি বাড়িতে আমাদের মেয়েরা অযথা বেড়াতে যেত না। বাকালীবাড়ির মেয়েরা আমাদের খুব ভালোবাসত।

আমি আবার সুন্দর করে চুল বাঁধতে পারতাম-ওরা চুল বাঁধার জন্য, খোপা বাঁধার জন্য, বিনুনি করার জন্য আমার কাছে আসতো। আমি বলতাম, আমি আর কয়দিন, তোরা চুলবাঁধা ভাল করে শিখে রাখ। মালা, সন্তোষদার মেয়েরা এ কয়দিনেই আমার ভক্ত হয়ে উঠেছিল। এত সবার সঙ্গে মিশে আনন্দ পেলেও মনটা সর্বদা আতঙ্কে কাটে। কমলদি মাঝে মাঝে চিড়ে ভাজা, মুড়ি ভাজা, কাঁচা আমের ভর্তা ও মোরব্বা এনে দেয়। দিনগুলো এক রকম ভালই কাটছিল। চাকলান থেকে ফিরে এসে দেখি, মা পোড়া টিন ও পোড়া খুঁটি জোড়াতালি দিয়ে কোনরকমে মাথা গুঁজার জন্য ছাপড়া তুলেছে। টাঙ্গাইল বাসা থেকে চৌকি নিয়ে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেছে। এখানে এসে দেখলাম, রাজাকারের সংখ্যা আরও বেড়েছে এবং তারা খুবই খারাপ প্রকৃতির লোক। মা আমাদের ঘরের বাইরে বের হতে দিত না।

আমাদের একটা কাঁচা-মিঠা আমগাছ ছিল। সেটা লম্বায় ২২ হাত তারপরে ডালপালা। ও গাছে সহজে কেউ উঠতে পারে না। অন্য গ্রামের কয়েকটা ছেলে ঢিল দিয়ে আম পাড়ছিল। কমলদি ওদের বলল, এভাবে হবে না, গাছে উঠে আম পাড়, তোমরাও খাও আমাদেরও দাও। ছেলেগুলো খুবই খারাপ, বড়দের মান সম্মান দিয়ে কথা বলতে জানে না। ধমকের সুরে একজন বলল, বারে, আম পাড়ব আমরা আর ভাগ দেব আপনাদের তা হবে না। কমলদিও রাগ করে বলল, যাও তোমাদের আম পাড়তেও হবে না, দিতেও হবে না। যাও চলে যাও। ওর মধ্য থেকে একটা ছেলে বলল, চলে যাবো তো? বুঝে বললেন তো? ঠিক আছে, পরে দেখব। এই কথা বলে অন্য ছেলেদের হাত ধরে জোর করে আমাদের বাড়ি থেকে হনহন করে চলে গেল। আমরা ওদের উগ্রতা দেখে একটু ভয়ও পেয়েছিলাম কারণ দিনকাল তো ভালো নয়।

৮ম পর্ব

এর মধ্যে মা টাঙ্গাইল গিয়ে ৩/৪ দিন থেকেছে। একদিন মা প্রতিবেশী কুমুল্লী বুড়িকে কুপি দিয়ে সন্ধ্যার পর পর এগিয়ে দিয়ে এসে দেখে কল্যাণ ও বাবাকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। মা চিৎকার করে উঠল, একি একজন বৃদ্ধ আর একজন শিশু, ওরা তো কিছু করেনি? একজন বলল, তুই বুড়ি কি জানিস। ওরা অনেক কিছু করতে পারে। মা তখন রাজাকারদের হাতে পায়ে ধরে বলল, বাবা এই দুজনই আমার সম্বল। বাবা তোমাদের পায়ে ধরি, এদের ছেড়ে দাও। বৃদ্ধ একজন রাজাকার বলল, বুড়িমা যখন এত করে বলছে, ছেড়ে দে। সত্যিই তো বৃদ্ধ আর শিশু কি করবে। অন্য আরেকজন বলল, আয় চলে আয়। এর মধ্যে একটা চ্যাংড়া ছেলে ট্রানসিস্টার হাতে নিয়ে বলল, তাইলে এটাই নিয়ে যাই, এই বলে ওইটাকে বগলে ফেলে হনহন করে চলে গেল। মা এতদিন তার মেয়েদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করত। এখন ছেলে ও স্বামীর জন্য কম চিন্তা নয়। বাবা ও ছোট ভাই কল্যাণকে নিয়ে ঘারিন্দার বাড়িতে মা চলে এলো।

একদিন রাত্রিতে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের বাড়ির ছাপড়ায় কমলদি, কল্যাণ, সোনালী, অঞ্জলী এই কয়জন শুয়েছিল। আমি তো বরাবর বড়মার কাছেই শুই কিন্তু সেদিন কল্যাণের জন্য আমাদের বাড়িতেই শুয়েছিলাম। বৃষ্টি কিছুটা কমার পর বড়দা উঠানে দাঁড়িয়ে বলছে, ঐ তোরা উঠতো, ও বাড়ি গণ্ডগোলের আভাস পাওয়া যায়। বড়দার বাড়ির সবাই এগিয়ে এসেছে ওরা শুনতে পেল জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। যে লোকগুলো ডাকাতি করতে এসেছিল, বৃষ্টি আসার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ার ভয়ে ওরা পালাচ্ছিল। এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়াতে ধরা যায়নি। ঘরে ডাকাতরা ঢুকে ফিসফিস করে কথা বলছিল। ওদের আওয়াজ শুনে কমলদি জেগে উঠে এবং বলে কে রে? হ্যারিকেনটা ওরা নিভিয়ে গিয়েছে, অন্ধকার ঘর। চৌকির সামনে সাইকেল ছিল, সেটা একটা ব্যারিকেড তৈরি হয়েছে। পোড়া ঘরের ডাবল জানালার বড় বড় লম্বা শিক নিয়ে কল্যাণ ওদের অন্ধকারেই মারতে লাগল। আর কমলদি হ্যারিকেন দিয়ে মারতে লাগল। আর আমি, সোনালী ও অঞ্জলী টিনের বেড়ায় লাথি মেরে শব্দ করতে লাগলাম, যাতে অন্যরা জানতে পারে এখানে কি হচ্ছে। সবাই তো বাড়ি থেকে এসে দেখে অঞ্জলী, সোনালী কাঁদছে। এসব দেখে পরের দিনই বাবা সংবাদ পেয়ে টাঙ্গাইল থেকে ঘারিন্দা চলে এসেছে। বাবারতো মহারাগ হলো পারেতো সবাইকে ধরে এনে এক্ষুণি শাস্তি দিক কিন্তু গ্রামের অন্য মাতব্বরেরা বাবাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। কুমুদ বিহারী দাসের গ্রামের প্রতি ও গ্রামের বাড়ির প্রতি ভীষণ টান ছিল। গ্রামের তমিজউদ্দিন তনু মাতব্বর ও অন্যান্য মাতব্বর ঠিক করল, আগামী জুম্মার নামাজের পর বেলা দুটোর দিকে আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় বসব। মাতব্বর বাবাকে বলল, আপনি তো বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতেই পারছেন। দেশ কোন শাসনেই চলছে না। দুর্বলেরা মার খাচ্ছে। এখন যদি আমরা থানা পুলিশ করতে যাই, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তার চেয়ে আসুন আমরা যা চাই তাই হবে। গ্রামের শান্তি রক্ষার্থে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি হোক। আগে থেকেই গ্রামের লোকেরা বাবাকে খুব ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। যথা সময়ে চুপচাপ বিচারসভা শুরু হলো। খান বাড়ির তমিজউদ্দিন, আমাদের বাড়ির জ্যাঠা মহাশয় শ্রী পঙ্কজ লোচন দে সরকার, সরকার বাড়ির অনিলচন্দ্র সরকার, বড়দা প্রতাপ লোচন দে সরকার ও বাবা কুমুদ বিহারী দাস। যথা সময়ে বিচার শুরু হলো।

আসামীরা সবাই আহত-কারো কপাল কাটা, হাত কাটা, গলাকাটা, গাল কাটা, মাথাকাটা, কেউই অক্ষত নয়। ওদের সরেজমিনে দেখে সবারই কিছু না বুঝার বাকী রইল না। মাতব্বরেরা জিজ্ঞেস করল কেন তোরা এমনটা করলি? আগে খোঁজ নিসনি? তখন ওরা মাথা নিচু করে বলল, খোঁজ নিয়ে এসেছি, মেয়েরা থাকে বলেই তো এসেছি, ছেলেটা কালই এসেছে আর ওতো ছোট স্কুলে পড়ে। মাতব্বরেরা জিজ্ঞেস করল, কার কাছ থেকে এ ইনফরমেশন পেয়েছিস? ওরা বলল, সমস্ত ইনফরমেশন খড়্গ দিয়েছে। এ কথা শুনে বড়দা নিজের চুল ধরে টানতে টানতে কাঁদতে লাগল। আর মাতব্বরদের হাতে পায়ে ধরে মাফ চাইতে লাগলো এবং সে নিজে ছেলেকে এখানে হাজির করাবে। মাতব্বরতো বলে গেল তারা যেন তার ছেলেকে কঠোর শাস্তি দেয়। একটু পরেই ছেলের কান ধরে টানতে টানতে বিচার সভায় নিয়ে এলো। ছেলেটি হুমড়ি খেয়ে বিচারকদের পায়ের তলায় পড়ল। বিচারসভাটি ছিল আমাদের বাড়িরই পঞ্চবটি তলা। সেখানে শুধু গাঁয়ের কয়েকজন ছিল। গ্রামটি ছিল হিন্দু প্রধান গ্রাম। অধিকাংশ অধিবাসীই তাঁতি। তাছাড়া সুতার, নাপিত, বাকালী, কর্মকার, নমশূদ্র, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বাদ্যকার, মালী ইত্যাদি বাস করত। শুধু অল্প কয়েক ঘর মুসলিম বাস করত। সেজন্যই সবাইকে সবাই চিনত, কেউ কাউকে অসম্মান করত না, গ্রামে হিন্দু মুসলমান সবার সঙ্গেই একটা সদ্ভাব ছিল। তবুও যখন সম্প্রীতির সভা হয় তখন ভরসা ও বিশ্বাসে চিড় ধরে।

যাদের বিচার করা হলো তারা সবাই মুসলমান। হিন্দু শুধু আমার ভাতিজা খড়্গ। বিচারকমন্ডলী বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবু আপনার মেয়েদের এখানে যদি ডাকি কিছু বলার জন্য তাতে কি আপনার আপত্তি আছে? বাবা বলল, বিচার সভায় আমার মেয়েদের আমার অনুমতি অবশ্যই দিতে হবে আমার মেয়েরা বিবেচক, সচেতন নাগরিক। আপনারা ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করুন। যখন ডাক আসল তখন ঠিক করলাম, কমলদি সমস্ত ঘটনাই জানে। আদ্যোপান্ত তার নখদর্পণে এবং কারণ অকারণ, ন্যায়অন্যায় সব কিছুই কারণ দেখিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারে। তাই ঠিক করলাম, কমলদি তুই বলবি।

মাতব্বররা আমাদের পঞ্চবটি তলায় নিয়ে গেল। প্রথমে মাতব্বর কমলদিকে জিজ্ঞেস করল, বলতো মা, কি হয়েছিল? কমলদি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আমরা তো কোন ক্রাইম করিনি, আমাদের কেন এ প্রশ্ন করছেন? অন্য মাতব্বররাও কমলদির কথাকে সমর্থন করে বলল, মা তো ঠিকই বলেছে, পূর্ব পাশে দাঁড়ানো অপরাধীদের আগে প্রশ্ন করতে হবে। সবাই সমর্থন জানিয়ে বলল, হ্যাঁ তাই করা উচিত। তাই হোক। একজন মাতব্বর বলল, তোমরা যে কেউ বলতে পার এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল,- আমরা বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এত আম দেখে আমাদের খুব লোভ হচ্ছিল, আমরা চারদিকে তাকাতাকি করছিলাম তখন দেখি উত্তর দিক থেকে খড়্গ আসছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ আম গাছ কাদের এত আম? খড়্গ বলল, কাদের আবার? আমাদের, খাবি, খা। তবে এদিকে আয়, এ গাছটা কাঁচামিঠা। আমের গাছে ঢিল মারতে মারতে দু'চারটে ঢিল হয়তো বাড়িতে গিয়ে পড়েছিল। সেজন্য হয়তো বাড়ির মেয়ে-ছেলেরা চেঁচামেচি করে উঠেছিল এবং আরও সজোরে বৃষ্টির মত ঢিল ছুড়ছিলাম।

তখন এক মহিলা জোর গলায় আমাদের ধমক দিলো Stop। ধমক শুনেই আমরা আহত হয়ে স্টপ হয়ে পড়লাম। মহিলা বলল, যে কয়টা পেড়েছ আর পাড়বে না, ওগুলো খুটে বাড়ি-নিয়ে যাও আরও যদি আম চাও তাহলে গাছে উঠে পাড়তে হবে। নিচ থেকে পাড়বে না। যাও, চলে যাও এক্ষুণি যাও। এমন কমান্ডিং ভয়েজ শুনে আমরা চমকে উঠেছিলাম, এমন ভয়েজ বাপ-দাদার মুখেও কোন দিন শুনিনি। আমরা একটা আমও খুটে আনিনি। খেয়েও দেখিনি পরে খড়গ এনে দিয়েছিল। বাড়িতে গিয়ে প্ল্যান করলাম মেয়েটিকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়। তখন সবার নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নিলাম। সবতো খড়গ জানতে পারেনি। এই নারীদের ভিতরে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ জ্বলছে। আমরা বুঝতেই পারিনি, হিন্দু রমণীরা যুদ্ধে পারদর্শিনী, ওরা পুরুষের চেয়েও শক্তিশালী। আমাদের অন্যায় হয়েছে আমরা মায়েদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের সঙ্গে ঝগড়ারও কোন ইঙ্গিত দেয়নি। দোষ আমাদেরই। ক্ষমা করুন আমাদের। মাতব্বর বলল, ঠিক আছে-আপাতত থাক, শোন তোমরা গ্রামে বাস করছ, শুধু মহিলাই দেখেছ, ভদ্রমহিলা দেখনি। তাই তুমি বললে, এক মহিলা জোর গলায় তোমাকে ধমক দিলো। মহিলা যে ভদ্রমহিলাও হতে পারে সেটা কিন্তু তোমাদের জানা নেই। যাক সেসব কথা, মা কমল, এখন, তোমার কিছু বলার থাকলে বলতে পারো।

কমলদি একটু এগিয়ে এসে সবাইকে প্রণাম করে বলল, জিজ্ঞেস করুন। মাতব্বর জিজ্ঞেস করল, ওদের তোমরা চিন? কমলদি বলল, না ওদের চিনিনা, শুধু খড়গকে চিনি। আমরা তো গ্রামে থাকি না, নানা অনুষ্ঠানে দুচার দিনের জন্য আসি, হইচই করতে করতে দিন কেটে যায়। একজন মাতব্বর বলল, আচ্ছা মা ওদের কি রকম শাস্তি পেলে তোমরা খুশি হবে? কমলদি বলল, খুশি হওয়া তো বড় কথা নয় ন্যায্য বিচার পেলেই আমরা খুশি। ওরা অন্যগাঁয়ের ছেলে আমাদের চিনে না লেখাপড়াও তেমন জানে না। বয়সও কম এমন বিবেচনা করে আপনাদের বিবেচনা মাফিক বিচার করবেন। আমার এক বোন হাই স্কুলের শিক্ষক, আর একবোন কলেজে পড়ে এরাও তো ওদের অভিভাবক স্বজন। আপনারা সব দিক বিবেচনা করে যেটা ভাল বুঝবেন করবেন।

এ কথা শুনে মাতব্বররা খুশি হলো এবং অপরাধীদের ডেকে বলল, দেখলে কেমন ভদ্রমহিলা ওরা, তোমাদের খারাপ হোক এটা ওরা চায় না, আজ এ বিষয়ে থানা পুলিশ করলে কি হতো। এমনিতেই দেশের পরিস্থিতি ভাল নয়, ছেলেদের বিশ ঘা করে বেতের বাড়ি আর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে বলা হলো। আমরা বললাম, ওরা মাফ চাওয়ার আগেই আমরা ওদের মাফ করেছি, ওরা ছোট ছেলে জীবনে একটা ভুল করেছে। অনেক দূর ওদের পথ চলতে হবে, ওদের ভুল শুধরে ওরা যেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চলতে পারে।

তনু মাতব্বর বলল, দেখ তোরা, কেমন লোক এবং এদের বিপদের মধ্যে তোরা যাদের আরও বিপদে ফেলতে চেয়েছিস, সেই আমাদের মায়েরা তোদের ছেলে মনে করে কত কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ চিনতে শেখ।

৯ম পর্ব

তিন বোন ও এক ভাতিজি নিয়ে বাড়ির সবাই খুবই চিন্তান্বিত কিন্তু কোন কিছুতেই কোন সুরাহা হচ্ছে না। শেষে আমি মাকে বললাম, মা, টাকা-পয়সার অভাব নানা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে ইন্ডিয়াতে চলে যেতে চাই। মা বলল, কেমন করে হবে? আমি বললাম, হবে না মা, হতে হবেই। এদিকে রাজাকারদের ইদানিং ঠাটবাট বেড়েই চলেছে। ওরা ধরাকে সরাজ্ঞান করছে। আগে যারা কামলা দিয়ে খেত, আধপেট খেয়ে কতদিন না খেয়ে দিন যাপন করেছে। রাজাকারের বদৌলতে আজ ওদের ছেলে-মেয়েরা ভালভাল জামা কাপড় পরেছে ভাল ভাল খাচ্ছে। এ বিষয়ে কারও কিছু বলার সাহস নেই। গায়ের লোকেরা তাদের খাতির করে, সম্মান করে সালাম জানায়। গ্রামে যখন রাজাকারদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেল, তখন মাও ভীষণ ব্যস্ত হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, জামালপুর ব্যাংক থেকে টাকা তুলে এবং বেতন তুলে ওখান দিয়ে ভাইদের নিয়ে শেরপুর কামালপুর হয়ে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ যাবো। দিদি কমলদিকে আমাদের সাথে যেতে বলাতে সে বলল, আমার যাওয়া হবে নারে, মা-বাবাকে কে দেখবে, তুই যা। ছোট বোন সোনালী বলল, মাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। মার কাছেই থাকবো। মা ছোট ভাই কল্যাণকে ছাড়ল না, বলল, কোন এক সময় সুযোগ বুঝে ওদের পাঠাবো। স্থির হল আমি আর বিমান যাবো। সঙ্গে জুটলো ন্যাপের নাসির ভাই। আমরা তিন জনে সকাল ৭ টায় রওনা হলাম, সদর রাস্তা দিয়ে না যেয়ে আকুর-টাকুর পাড়া ছাড়িয়ে এলেঙ্গার অদূরে গাড়িতে উঠি। পরে জানতে পারি আকুর-টাকুর পাড়ার কম্যুনিস্ট পার্টির নাজির হোসেন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি নাকি বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে যাচ্ছি। তাই মনে মনে শুভ যাত্রা বলে আমাদের বিদায় দিয়েছিলেন।

এলেঙ্গা ছাড়িয়ে উঠলাম। সারা গায়ে ছাই মাখা, হাত ভর্তি নানা রঙের কম দামের কাচের চুড়ি, মাথায় তেলহীন খোলা চুল। পরনে কমদামের জোনাকী শাড়ি, পায়ে কম দামের হাওয়াই চপ্পল, হাতে প্লাস্টিকের একটি বাস্কেট ব্যাগ, এই হল সম্বল। বাসে উঠার সময় ড্রাইভার সাহেব কেমন সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল। তাতে আমারও খুব ভয় ভয় করছিল। শুধু ভয় ভয় কেন? ভয়ে কুকরে যাচ্ছিলাম। প্রতিটি স্টপেজে বুকটা ধুক ধুক করে উঠতো। এভাবে চলতে চলতে বাস ক্রমে মধুপুর পৌঁছাল। বাস কন্ডাক্টর এসে বলল, বাসের সব যাত্রী নিচে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ান আর মহিলারা বাসের ভিতরেই থাকুন। আমার তো ভীষণভাবে প্যালপিটিশন শুরু হলো। ড্রাইভার আমার পাশে জানালার পাশ দিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটছে, আর আমাকে বলছে কিছুতেই নিজের নাম বলবেন না মুসলমানী নাম বলবেন। এদিকে নিচে নামিয়ে যাদের নিয়ে গেছে তাদের হিন্দু মুসলমানী পরীক্ষা হবে। ছোট ভাই বিমানটার জন্য উৎকণ্ঠায় আছি। আবার নিজের কথা কি ভাববো। আমি একা মহিলাযাত্রী। গাড়িতে উঠেই মিলিটারি জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাবে? আমি

বললাম, জামালপুর। ওখানে কি শ্বশুর বাড়ি, সঙ্গে কে? ছোট ভাই। তোমার নাম কি বললে, রোকেয়া বেগম। সবকিছুর উত্তর উর্দুতে বলে দিয়েছে ড্রাইভার। ১০ মিনিট পরে দেখি বিমান ও নাসির বাসে উঠেছে। বাসের অন্যান্য যাত্রী বলল, মিলিটারির এ গুণটা ভাল। এটা বলুন, আমাদের ভাগ্য ভাল। প্রতিটি স্টপেজেই গাড়িতে মিলিটারি উঠে খানা তল্লাশী করত।
গভীর উৎকণ্ঠায় ধনবাড়ী, দিঘপাইত, কান্দিনা, ইকবালপুর হয়ে জামালপুর বাসস্ট্যান্ড এসে পৌঁছলাম তখন দেখি স্ট্যান্ডের দোকান-পাট, লোকালয়ের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে ভূতুরে রাজত্ব তৈরি করেছে। জামালপুর বাসস্ট্যান্ড এসে আমার এত কান্না পাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমার কাছে সব অচেনা। ড্রাইভার এসে বলল, স্কুলে পৌঁছে দিবো, কিনা? এত ভয়, এত বিপদের মধ্যেও এখনও এত ভাল মানুষ আছে যাদের সত্যিই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। ড্রাইভার বলল, যতই ছদ্মবেশ নেন না কেন? বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দেখলে বোঝাই যায় শিক্ষিত ভদ্র মহিলা। সাবধানে যাবেন। আমি একটা রিকশা নিলাম জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দিকে যাওয়ার জন্য। আর একটা রিকশা নিয়ে আমার সঙ্গে নাছির উদ্দিন ওর আত্মীয়ের বাড়ি গেল। আমার এখানকার কাজ শেষ হলে আমরা চলে যাবো। নাছির যেন প্রয়োজনে আমাকে ফোন করে স্কুলে।

১০ম পর্ব

আমার সঙ্গে বিমান ছিল, তাই সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে হোস্টেলের পিছন দরজা দিয়ে ঢুকলাম। মনি অতটুকু দরজা দিয়ে আফছাভাবে আমাকে ঢুকতে দেখেছে কিন্তু আমি কে, তা জানে না। মনি ভেবেছিল, স্কুলের জন্য যে আয়ার প্রয়োজন দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে হয়তো তাদেরই কেউ। মনি একটুও আমাকে চিনতে পারেনি। ঘোমটা খুলে বললাম, মনি আমি ভাল করে চেয়ে দেখ। তখন মনি আমাকে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলল, শেফালী, তুই বেঁচে আছিস। দাঁড়া চাবি নিয়ে আসি। মনি চাবি ও হোস্টেল সুপার রোকেয়া আপাকে হোস্টেলে নিয়ে এলো এবং ঘরের তালা খুলে আমাকে ও বিমানকে ঘরে ঢুকাল। হোস্টেলের দারোয়ানকে ডেকে একটা রুম পরিষ্কার করতে বলল। আরও বলল, দিদিমনির উপস্থিতি যেন বাইরের কাকপক্ষিও টের না পায়। এখন উনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের। তখন আগস্ট মাস চলছে। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি চলছে। রাতে রাজাকাররা হোস্টেল পাহারা দেয়।
এই অবস্থায় আমি বিমানকে সঙ্গে নিয়ে হোস্টেলে থাকছি। এখান থেকে পালাবার সুযোগ পেলে আর কিছু টাকার সংস্থান করতে পারলেই এখান থেকে চলে যাবো কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। জুলাই মাসে আমাকে মিলিটারি হেডকোয়ার্টার থেকে চাকরি থেকে টারমিনিটেড করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার আর কিছু করার নেই। হেডমিস্ট্রেস সম্পূর্ণ আমার বিপক্ষে অবস্থান করছে। রাজাকার ও মিলিটারির ভয়ে রাস্তায়ও বের হতে পারছি না। তাছাড়া পয়সাও নেই। হোস্টেল সুপার রোকেয়া আপা আমার বড় বোনের মত আদর করে মাথা হাতিয়ে আদর করে বলত, আপনি কখনও চিন্তা করবেন না। আপনার ও আপনার ছোট ভাই-এর দায়িত্ব আমার। আমি আমার বাড়ি হাজিপুর থেকে চাল এনে আমার ভাইকে খাওয়াবো। কোন রকম চিন্তা ভাবনা কিছু করবেন না। আপনি আমাকে আপা ডেকেছেন তো? আপার কর্তব্য আমি অবশ্যই করব। উনার এত অভয় ও সান্ত্বনা বাক্য শুনে আমি আরও ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগলাম। খুবই মাতৃসুলভ মনোভাব উনার। কাছে এসে আমাকে জাপটে ধরে আরও সান্ত্বনা দিতে লাগল।
তখন এনায়েতুল্লাহ হোস্টেলের দারোয়ান রাজাকারদের শোনানোর জন্য আমাকে ডাকছে। আপা, বাইরে আপনার জন্য ওযুর পানি রেখেছি। নামাজের সময় হয়েছে। রোকেয়া আপা বলল, দেখুন ওরা আপনাকে কত ভালোবাসে। আপনাকে রক্ষার জন্য নামাযের আয়োজন করেছে। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। আমি মনে মনে ভাবলাম সত্যিই তো! আপাকে জড়িয়ে ধরে যখন আমি কাঁদছিলাম তখন আমার স্নেহধন্যা আপার দুই কন্যাও আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।
তখন মনে হচ্ছিল, এই তো জীবন আমার আর কিছুই দরকার নেই। রোকেয়া আপা আমাকে সত্যিই নিজের বোনের মত ভালোবেসেছিল। রোকেয়া আপার ছোট মেয়ে মেরী হোস্টেলে থাকত। তাই ওর উপর আমার মমতাও বেশি ছিল। মেয়েটো কি

শান্ত, কথাবার্তা কম বলত, আবার মায়া-মমতাও প্রচুর। যেমন করেই হোক এখান থেকে আমাকে চলে যেতেই হবে। কারণ সঙ্গে বিমান আছে, ওকেতো বাঁচাতে হবে। আর যে কষ্টে সে হোস্টেলে লুকিয়ে আছে এমন কষ্ট করে মানুষ বাঁচতে পারে না। একমাত্র রোকেয়া আপার কৃপায় বিমান বেঁচে আছে। অবশ্য অন্যদেরও মন মানসিকতা উদার ছিল, কেউ আগ্রাসী মনোভাবের ছিল না। শুধু হেডমিস্ট্রেস বাদে অন্যরা যারা জানত বিমান হোস্টেলে লুকিয়ে আছে, তারা মুখ ফুটে কোনদিনও কিছু বলেনি। আমি স্থির করলাম ইন্ডিয়াতে যেতেই হবে এবং আমি তার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। রোকেয়া আপা বলল, আমার বাড়ি হাজীপুর থাকবে? আমি বললাম, না আমি বাঁচার জন্য একটা ঝাঁপ দিয়ে দেখি কি হয়।

১১শ পর্ব

টাকা পয়সা না থাকলে খালি হাতে কোথাও যেতে পারছি না। তাই প্রধান শিক্ষিকাকে বললাম, বড় আপা আমার হাতে তো কিছুই নেই বাড়িও যেতে পারব না, আমিতো মার্চ মাসের পুরো বেতন পাই। রাগত কণ্ঠে প্রধান শিক্ষিকা খোরশেদা বেগম বললেন, কীসের পাওনা? তুমি তো অগ্রিম বেতন নিয়েছ বন্যা-ত্রাণের জন্য। সরকারি টাকা পরিশোধ না করে কোথাও যেতে পারবে না। আমি পাকসেনাদের এখনই খবর দিবো। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম এ কেমন ব্যবহার। কুমুদিনী কলেজে দু'জনেই পড়েছি, আমি ১ম বর্ষে উনি তৃতীয় বর্ষে পড়তেন। তাছাড়া কুমুদিনী কলেজের একটা সুনাম আছে। সকল ছাত্রী বোনের মত থাকত। আমি কম্পিত কণ্ঠে বললাম,-একি বলছেন আপা। আপনি কি জানেন না, একটি মেয়েকে পাক বাহিনীর হাতে তুলে দিলে তার পরিণতি কি হবে? বড় আপা আরও জোরে জোরে বললেন, ওসব বোঝার আমার দরকার নেই। আমি কেঁদে ফেললাম। নিজেকে এত অসহায় বোধ কোনদিনও করিনি। না হয় আমি মরতাম, কিন্তু সঙ্গে যে আদরের ভাই আছে। তাদের কি ব্যবস্থা করবো। ভাবতে ভাবতে লম্বা ঘোমটা টেনে একটা রিকশা নিয়ে এস.ডি.ও সাহেবের বাংলোতে গেলাম। উনি আমার পূর্ব পরিচিত। উনার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক, দুলাভাই বলে ডাকি। উনিও ছোটবোনের মত আমাকে স্নেহ করতেন।

উনার বাড়ি কুমিল্লা জেলার লাকসামে। এস.ডি.ও সাহেবের নাম আব্দুল মান্নান ভূইয়া। উনি তার বাংলোর বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখেই ত্রস্ত পায়ে কাছে এসে অবাক হয়ে বলল, একি তুমি কবে এলে এবং কেন এলে? আমার দুলাভাইয়ের প্রশ্নবাণে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, আপা আছে তো। ভিতরে চলুন অনেক কথা বলার আছে। আপাকে ডাকতে ডাকতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে গিয়ে বলল, দেখতো কে এসেছে? এই বিপদে ছোটরাণী আমাদের ভুলেনি। আমি দুলাভাইর আরও কাছে যেয়ে বললাম, এখন এসব কথা থাক, পরে হবে না হয়। আমার কথাটা দয়া করে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। জামালপুরে আসা, প্রধান শিক্ষিকার ব্যবহার এবং সেনাবাহিনী হেড কোয়ার্টার থেকে আমাকে চাকরিতে টারমিনেটেড করা সমস্ত বিস্তারিতভাবে উনাকে খুলে বললাম। উনি সত্যিই আমার কথা শুনেছেন কিনা বুঝলাম না। উত্তরে উনি বললেন, একটা কাজ করা যায়। যতদিন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলবে ততদিনের জন্য এই এস.ডি.ও সাহেব তোমাকে কন্ট্রাক্ট বেসিস বিয়ে করবে। এছাড়া তোমার অন্য কোন উপায় নেই, রাজী? দুঃখের সময় এমন ইয়ার্কি ফাজলামো ভাল লাগে না। গঠনমূলক কথা বলুন।

-আরে আরে আমার ছোটরাণী রাগ করছো কেন? এই দুঃখের দিনে এমন কথা তো বলা উচিত। আনন্দে হাসি তামাসা করতে পারলেই তো মনটা প্রফুল্ল থাকবে।

-আমার সময় কম, এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরতে হবে।

- আমি কি করতে পারি ছোট রাণী, আমি আমার গাড়ি করে তোমাকে শেরপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি, বাকীটুকু তোমাকেই একলা যেতে হবে। আমি বললাম, আমার জন্য এমন একজন মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তিকে বিপদে ফেলতে চাই না। এস.ডি.ও সাহেবের স্ত্রী আমার আপা আমার হাতে টাকা নেই জেনে আমাকে ১০০ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি চলে যাও। শুভেচ্ছা রইল। হোস্টেলে আমার কাঁসার থালা, বাটি, গ্লাস বিক্রি করে সামান্য টাকা পেলাম। আমার সহকর্মী জাফুরা খাতুন হেনা আমার হাতে ৫০ টাকা দিয়ে বললেন অতিসত্বর চলে যাও। আমি আমার অতি সখের সেতারাটা ওর হাতে তুলে দিলাম।
ভাইটাকে হোস্টেলের রুমে বন্ধ করে রেখেছি, এক বেলা কোন রকমে খেতে দেই। বন্ধঘরে আটকে থাকা যে কত কষ্টের, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। এস.ডি.ও. সাহেবের বাসা থেকে এসে হোস্টেলের নাইট গার্ড আমানুল্লাহর সঙ্গে আলাপ করি। নাইট গার্ড আমাকে প্রচুর আশ্বাস দিয়ে শঙ্কামুক্ত করার চেষ্টা করল। আমানুল্লাহ ৬০ টাকা দিয়ে একটা ছৈওয়ালা নৌকা ভাড়া করল। খাওয়া মাঝির মধ্যে, কামালপুর বর্ডারে পৌঁছে দিবে। ভোরবেলায় আমানুল্লাহ আমাকে বোরকা পরিয়ে একটা রিকশা ও অন্য আরেকটি রিকশায় দুই ভাইকে নিয়ে আমরা ঘাটের দিকে যাচ্ছি। ভাইদের রিকশা পার হওয়ার পর ৪/৫ জন লোক এসে আমাদের রিক্সা থামাল, বলল, কোথায় যাচ্ছ? আমানুল্লাহ বলল, শ্বশুরবাড়ি ইকবালপুর যাচ্ছি। ওর মধ্যে এক লোক বলল, সাথের মহিলা তোমার কে হয়, আমানুল্লাহ চট করে উত্তর দিল-আমার বিবি। ওদের ভিতর আর একজন বলল, ছেড়ে দে, যেতে দে, দেখছিস না ওদের কাছে কিছুই নেই। রিকশা থেকে নেমে আমানুল্লাহ আমাকে প্রণাম করে কেঁদে ফেলল। বলল আমাকে মাফ করবেন, এছাড়া আমার উপায় ছিল না। বলল! আল্লাহ আপনার সহায় হউন। আল্লাহর রহমতে আপনারা যেন সঠিক স্থানে পৌঁছাতে পারেন। তারপর একটা থলি বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, দিদিমনি চিঁড়া, মুড়ি ও গুড় আছে বাকী যা দরকার মাঝি ভাইকে বলা আছে। সে ব্যবস্থা করে দিবে। আমানুল্লাহ আমাকে এত ভালোবাসে, এত শ্রদ্ধা করে! এ কথাটা অনুভব করে আমার মাথা নত হয়ে আসল। ওর সঙ্গে আমি কেঁদে ফেললাম। আবার আমানুল্লাহর বুদ্ধিমত্তার কথাটা মনে পড়ল। হোস্টেলে রাজাকাররা রাতে পাহারা দেয়, তাই আমাকে রক্ষা করার জন্য আমানুল্লাহ আমাকে ডেকে বলল, আপা, বারান্দায় ওযুর পানি দিয়েছি ওযু করে নামাজ পড়ে নিন। ওদের উদারতা ও মহত্ত্বের জন্য কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারেনি। চিরকাল ওদের উপকারের কথা মনে রাখবো। তাড়াহুড়ো করে আমাদের নৌকায় তুলে দিয়ে নাইটগার্ড চোখ মুছতে মুছতে হোস্টেলে চলে গেল। আর আমরা ভরা বর্ষায় আগস্ট মাসে দুঃখ লাঘব করতে নদীর স্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নৌকা তরতর করে চলতে লাগল ব্রহ্মপুত্রের কূল ঘেঁষে।

১২শ অধ্যায়

যে নৌকা করে আমরা যাচ্ছিলাম, সে নৌকার মাঝির নাম করিম মিয়া। সে আমাদের নৌকার ভিতরে খুপরিতে ঢুকিয়ে দিল। আর বলল, চুপচাপ বসে থাকবেন। বেশি নড়াচড়া ও কথাবার্তা বলবেন না। মাঝে মাঝে নদীর এপার ও ওপার থেকে লোকেরা জিজ্ঞেস করে কোথায় যাও? নৌকায় কি আছে? মাঝি উত্তর দিত নানার বাড়ি যাই। নৌকায় কিছু নেই, নানীকে নাইওর নিতে যাচ্ছি। দুপুরের দিকে মাঝি ডালভাত রান্না করে আমাদের খাওয়ালো। মোটা লাল চালের ভাত আর খেসারীর ডাল যে এত স্বাদ এর আগে জানতাম না। মাঝি নিজেই পরিবেশন করে নৌকার খুপরি বন্ধ করে দিল? সন্ধ্যার দিকে করিম মিয়া নৌকা নিয়ে গ্রামের দিকে একটা বিরাট ঝোঁপের নিচে নৌকা বাঁধল। বলল, ভাইরা আপনারা ঘুমিয়ে পড়ুন। কোন চিন্তা নেই, এ গ্রামে কোন রাজাকার বা পাকসেনার উৎপাত নেই। সূর্য উঠার আগেই আমরা চলে যাবো। দূরের নদীতে লঞ্চের উপর থেকে মাঝে মাঝে পাক সেনারা সার্চ লাইট মারত। প্রথমে আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, করিম মিয়া আমাদের অভয় দিয়ে দুশ্চিন্তা না করতে বলল। বিকেল ৪ টার দিকে করিম মিয়া বর্ডার এলাকা কামালপুরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, একলোক এসে বলল, কোথায় যাবেন? ভারত যাবেন তো? আমরা বললাম, মাস্টার সাহেবের বাড়ি যাবো। লোকটি বলল, ও রকিবুল মাস্টারের বাড়িতে যাবেন? আসুন। লোকজনের এত আগ্রহ দেখে কেমন সন্দেহ হতে লাগল। এটাই বুঝি রাজাকার, এখনই ধরে নিয়ে যাবে।
বর্ষাকাল একটু পরপর বৃষ্টি নামছে, উচু থেকে নিচুতে নামতে গড়গড়িয়ে পড়ে গেলাম। এক ভদ্রলোক এসে ভাইদের বলল, তোল, তোল, এমন রাস্তায় এরা কোনদিন হেঁটেছে নাকি। আবার বৃষ্টি নামল, আমরা স্কুলের বারান্দায় ঠাঁই নিলাম। ওখানে একলোক এসে বলল, আপনারা ইন্ডিয়ায় যাবেন তো? শুনেই আৎকে উঠলাম। লোকটা বলল ভয়ের কিছু নেই। আমরা সকালে ইন্ডিয়া যেয়ে বাজার করে বিকালে চলে আসি। খানিকদূর হাঁটার পর আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। লোকটা একটা বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। আমাদের বাঁশের মাচাং-এ বসতে দিল।
মাচাং-এর নিচে একটি টিনে আলু ও পিয়াজ রেখেছে। জিজ্ঞেস করাতে বলল, নিচে বাংকার, যখন খুব গোলাগুলি হয়ে তখন আমরা ওর নিচে লুকোই। বৃষ্টি থেমে গেলে লোকটা আমাদের নিয়ে বের হয় দেখালো ঐ যে নালাটা ওর ওপাশেই ইন্ডিয়া। আমরা দেখলাম সত্যিই তো কত কাছে। আরেকজন লোক ধমকের স্বরে বলল, এই থামো, যাচ্ছ কোথায়? আমরা ভাবলাম, এই সেরেছে এরাই বোধ হয় রাজাকার। দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটা বলল, দেখছ না রাস্তা ফাঁকা যা দু'চারজন সাধারণ লোক চলাফেরা করছে। মিলিটারি থাকলে রাস্তায় একটা লোকও থাকতো না, আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে নিয়ে যাও। লোকটা আমাদের নিয়ে মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জের বাজারে রেখে বিদায় নিল। আমার হাতে খুচরা ১০ টাকা ছিল তাই লোকটার হাতে দিলাম।

তখন BSF দেখে, ওদের খাকী পোশাক দেখে এত জোরে দৌড় দিলাম। ভাবছিলাম এই বুঝি পাক মিলিটারির হাতে ধরা পড়লাম। ট্রেনিং প্রাপ্ত বি.এস.এফ. এর সঙ্গে দৌড়ে কি আমি পারবো। পরে অবশ্য ওরা বলেছে, আমি নাকি এক মাইল ওদের দৌড়ে নিয়েছি। এত জোরে আমার হাতটা ধরেছিল এখনও অমাবস্যা-পূর্ণিমা এলেই হাতটা ব্যথা করে। ওরা হিন্দী ভাষায় আমাকে থামতে বলেছিল কিন্তু ওদের হিন্দী ভাষার ভয়ে উৎকণ্ঠায় আমি উর্দু শুনছিলাম। তাই সাধ্যমত দ্রুত দৌড়েছিলাম। ওরা থানায় আমাকে বসিয়ে রাখল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সঠিক পরিচয় পাওয়া না যায় ততক্ষণ ওরা আমাকে থানায় রাখবে। ইতোমধ্যে ন্যাপ নেতা রবি নিয়োগীর লোকজন, জামালপুরের এম.পি আব্দুল হাকিম, দেওয়ানগঞ্জের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কামাল ঠাকুর ও মুকুল চৌধুরী, জামালপুরের ছাত্র ইউনিয়নের ছেলে এসে প্রকৃত পরিচয় দিল। সন্ধ্যার পরপর আমাকে ওরা ছেড়ে দিল। কিন্তু এখন কোথায় যাই। কাছাকাছিই ছিল সি.পি.আই.-এর অফিস ও সেক্রেটারি আলাউদ্দিন সাহেবের বাড়ি।

১৩ শ পর্ব

আলাউদ্দিন সাহেব সস্ত্রীক ওখানেই থাকেন এবং অন্য ঘরগুলোতে দেওয়ানগঞ্জের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কামাল চৌধুরী ও মুকুল চৌধুরী তার মা, স্ত্রী ও পুত্র উপলকে নিয়ে থাকত। আলাউদ্দিন সাহেবের ওখানে জায়গা পেয়ে ও দেওয়ানগঞ্জের চৌধুরীদের সান্নিধ্য পেয়ে দিনগুলো ভালই কাটছিল। ভাল লাগলে কি হবে? অন্যরা সবাইতো সপরিবারে এসেছে, শুধু এক ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি এসেছি। পরিবারের সবাইতো টাঙ্গাইল পড়ে রয়েছে। মা-বাবা, ভাইবোন সবার জন্য চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছি। এখানকার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি দিয়েছি, তারা নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি দিয়েছে। আর তাদের ওখানে চলে যাবার পথ নির্দেশনা দিয়ে চিঠি দিয়েছে। তারা কেউ আসেনি এমন দুর্গম স্থানে। কেউ এসে রিলিজ না করলে তো আমরা এখান থেকে বের হতে পারবো না। একদিন আমাকে থানা থেকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি টাঙ্গাইলের কমরেড নারায়ণ বিশ্বাসকে চিনেন? বললাম, হ্যাঁ চিনি। বলুন তো উনার চুলের রং কি?-বললাম, সাদা ধবধবে। আচ্ছা বলুনতো উনার দাড়ি কতটুকু? বললাম, এটা বলতে পারবো না। কেননা উনার দাড়ি আমি দেখিনি। আপনারা যদি উনাকে জেনে থাকেন তবে উনার বর্তমান ঠিকানাটা আমাকে দিন। থানার পুলিশ অফিসারকে সবাই ডাকত মি. ড্যাশ। মি. ড্যাশ উত্তর দিলেন, আপনার বন্ধু মি. আলাউদ্দিন সাহেব জানেন। আমি উনাকে বললাম, ধন্যবাদ, বন্ধু তা বেশ। এই দুর্দিনে বিদেশ বিভুঁইয়ে বন্ধু পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। পথে-ঘাটে মাঝে মাঝে মি. ড্যাশ-এর সঙ্গে দেখা হলেই বলত, আপনার বন্ধু আপনাকে হেল্প করছে তো? আমি উত্তর দিতাম অল্প কথায়-অবশ্যই।

আলাউদ্দিন ভাইকে বলে আমাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করলাম। কারণ আমরা শরণার্থী-ক্যাম্পে থাকতে পারবো না এবং ১০ টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিলাম, কতদিন আর পার্টির লোক বলে আলাউদ্দিনকে বিরক্ত করব। আলাউদ্দিন ভাই খুবই অমায়িক ও পার্টির লোকদের প্রতি খুবই অনুগত। উনার কাছ থেকে নারায়ণ বিশ্বাস মানে আমার কাকার ঠিকানা নিয়ে আমার পৌঁছানোর খবর দিলাম। আমি কোথায় আছি, কীভাবে আছি, অকপটে সব উনাকে জানালাম। একদিন এর মধ্যে এম.পি. (জামালপুর) আব্দুল হাকিমের ভাতিজা বস্তার মধ্যে হাঁড়ি, পাতিল, কড়াই, চালডাল, তৈজসপত্র, চা, কফি, চিনি, গুড় নিয়ে এসে বলছে, আপনার যন্ত্রণায় আমরা একটু বসেও থাকতে পারছি না, শেফালী দাস না খেতে পেরে মরে যাচ্ছে। তাকে ত্রাণের কোন সামগ্রীই দেওয়া হয়নি; কলকাতা থেকে তারা এতকিছু কি করে জানে? এখন দেখি ভালই আছেন। আমি বললাম, জামালপুর তো খেতে পেয়েছি, তাই বিরক্ত করিনি, এখন নিশ্চয়ই খেতে পাই না তাই খেতে চাচ্ছি। ছেলেটি বলল, আচ্ছা সেলিনা বানু কে বলুনতো? বললাম কে আবার, উনি একজন নেত্রী, টাঙ্গাইলের নেত্রী, কুমিল্লার নেত্রী, পাবনার নেত্রী। চিনতে পেরেছেন? জনদরদী নেত্রী, তাই আমাদের জন্য কাঁদেন এবং আমাদের পক্ষ হয়ে আপনাদের বলেন উনি

১৯৭০ সালে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে পাবনা শহরে কুড়েঘর প্রতীক নিয়ে ন্যাপের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করেন।
সেলিনা বানুর গোটা পরিবারটাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই উনি উদার চরিত্রের ছিলেন। সেলিনা বানু যে বৃত্তির টাকা পেতেন তা তিনি গরীব ছাত্রীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। মন মানসিকতা সত্যিই খুব উদার। ছেলেটাকে সেলিনা বানু সম্বন্ধে এত কথা বললাম কিন্তু কিছুতেই তার মন ভরল না। বলল, এখন এটুকুতেই শান্ত থাকুন পরে ত্রাণ এলে সবার আগে আপনাকে পাঠাবো আর ঐ ভদ্র মহিলাকে বিরক্ত করবেন না। আমি বললাম, আপনি তো সেলিনা বানুকে দেখেননি, একবার দেখলে আপনার সব ভুল ভেঙে যাবে। কলকাতাতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, উনার কাছে নিয়ে যাবো। এত ভাল মানুষ আপনি জীবনে কখনও দেখেন নি, আপনিও মোহিত হবেন। অনুরোধ রইল, মাঝে মাঝে খবর নিতে এখানে আসবেন।
যাদের ঘরটি ১০ টাকা মাসিক হিসাবে ভাড়া নিয়েছি, ওরা পশ্চিম পূর্ববঙ্গের বাঙালি কিন্তু পশ্চিম বঙ্গীয়দের ভাষাতেই কথা বলে। পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া ভাগ হওয়ার কালে ওরা শেরপুর জেলার শ্রীবর্দির বাসিন্দা ছিল, সুযোগ বুঝে ওরা মহেন্দ্রগঞ্জে বাঙালি মহলে বসবাস করে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করে। ওখানকার আদিবাসীদের ভাষা আলাদা হলেও বাংলার সাথে মিল আছে এবং সহজেই বুঝা যায়। ঐ বাড়িতে বুড়া-বুড়ি ও একজন নাতনী বাস করে। বাড়িটা বড়। দেখে মনে হয় এককালে এদের বড় ব্যবসা ছিল। মহেন্দ্রগঞ্জের বাজারের পাশেই বাড়ি। টিনের চৌচালা ঘরে বাড়ির মালিক থাকে। আর পাশের চৌচালা ঘরে কোঠা করা ঘর গদি পাতা ফরাস বিছানো। দেখে মনে হয় ওটা উনাদের গদি ঘর ছিল বর্তমানে ব্যবসা নেই কিন্তু ব্যবসার বন্দোবস্তুটুকু রয়েছে। ঘরের এক সাইডে গদি ও আর এক সাইডে মেঝে। মেঝেটা কাঁচা। আমরা ঘরটা ভাড়া নিয়ে নিজেদের মত করে সাজালাম। নিজের মত করেই বা কি? আমাদের বিছানাপত্র বালিশ কিছুই নেই ভাগ্যিস ভদ্রলোকের ঘরটি গদিঘর ছিল, তাই মাটিতে শুয়ে অসুখে পড়িনি। সর্দি জ্বর না হলে কি হবে, গদির ভিতরে এমন ছারপোকা যে এক মুহূর্ত বসে থাকা যায় না। ছারপোকার পাল্লায় এমনভাবে কোনদিনও পড়িনি।
বাড়িটি দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল, পাহাড়ের পাদদেশে খুব ভাল আবহাওয়া, মনে হয় শান্তির নীড়। রাত্রিতে ঘুমোতে পারছি না বলে, ভাবলাম সকালে একটু হেঁটে দেখি। খানিকদূর রাস্তা দিয়ে হেঁটে দেখি জামালপুরের ছাত্র ইউনিয়ন-এর ছেলেরা। এদের মধ্যে আনসারী এগিয়ে এসে বলল, দিদি এগুবেন না। আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, কেনরে কি হয়েছে? ছেলেটা বলল, একটা পাকবাহিনীর লোক জ্যান্ত ধরা পড়েছে ওকে এদিকেই নিয়ে আসছে। যাও তুমি ভিতরে যাও। আমি তৎক্ষণাৎ চলে গেলাম।

১৪শ পর্ব

বিকেল বেলায় আলাউদ্দিন ভাইয়ের বাসায় গেলাম। মুকুল চৌধুরী নেতার মাকে খালাম্মা বলে ডাকতাম। খালাম্মা আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে কাছে আসল। বাড়ির সামনেই মাঠের মত সেখানে উনার দুই ছেলে ও আলাউদ্দিন ভাই মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে আলাপরত। আমি পান খাই, খালাম্মাও পান খান, তাই খালাম্মাকে বললাম, পাশে ছোট একটা বাজার আছে, চলুন পান কিনে দু'জনে খাই। আমাদের কিন্তু পান খাওয়ার মত পয়সাও নেই। তাও আমি একটি পান কিনে দুখন্ড করে ভাগ করে অর্ধেক খেলাম ও অর্ধেক কাপড়ের খুটে বেঁধে রাখলাম। বাকী অর্ধেক খালাম্মাকে খেতে দিলাম। এটা দেখে দু'ভাই ও আলাউদ্দিন ভাই খুব রাগ করল। আমরা ছোট বাচ্চাদের মত মাথা নিচু করে চলে এলাম, আর ছেলেদের কাছে খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। আমি একজন টিচার, কোথায় ওদের আমি শিখাব তা না করে ছেলেগুলো আমাকে শিখাচ্ছে। লজ্জা পেয়ে ওখান থেকে ফিরে এসে বাড়ি এলাম। বাড়ির মালিকের কাছে গিয়ে বললাম, দাদা, মরে গেলাম।
দাদা হেসে বলল, কীভাবে? মরা তো এত সহজ নয়, যারা পাক মিলিটারির হাত থেকে বেঁচে এসেছে তারা তো এতো সহজে মরবে না। বল তোমার সমস্যা কি? বললাম, ছারপোকা! ছারপোকার জ্বালায় রাতদিন কখনও ঘুমোতে পারছি না। দাদা হেসে উঠে বলল ও এই সমস্যা দাঁড়াও আজই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলেই দাদা বাজারে গিয়ে ছারপোকার এক প্যাকেট বাগবোম নিয়ে এলো। এসেই বলল, ওটা এখানে চৌকির ফাঁকা জায়গায় ঢুকিয়ে দাও। প্যাকেটটা সমান্য একটু ফুটো করে চৌকির ফাঁকা জায়গাতে ঢুকিয়ে দিতে লাগলাম। আর নিচ থেকে ভুড়ভুড় করে ছারপোকা উপরের দিকে উঠছে। মনে হচ্ছিল যেন ম্যাজিকের মত বের হয়ে আসছে। যাক ভাবলাম ছারপোকা তাড়াতে পারছি। সেদিন বেশ ভালই ঘুম হলো। কিন্তু কি আর ভাল হলো। দু তিন দিন পর আবার যা তাই হতে লাগল। আবার দাদাকে বললাম, দাদা আপনার পোষ-মানা ছারপোকাতো সরতে চায় না। কি হবে এখন? দাদা রসিক মানুষ বলল, এতদিন তো দেশীয়দের রক্ত পান করেছে, তাতে তেমন স্বাদ না পেয়ে বিদেশিদের মিষ্টি রক্তের স্বাদ কি ছাড়তে পারে? দেখি কীভাবে সরানো যায়। আবার প্যাকেট আনো এবং এইভাবে পরপর ৩/৪ দিন দিতে থাকো। তারপর কয়দিন আর দিবে না, দেখবে আস্তে আস্তে ওরা চলে গেছে। কিন্তু একেবারে ওরা যাবে না। এইভাবে যাবে আসবে, তারপর বাগবোম মারতে মারতে একদিন সত্যি চলে যাবে। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবলাম, একি কখনো একা একা যায়। এতকষ্ট ও এত দুঃখের মধ্যেও আমার আত্মীয়-স্বজনের সান্ত্বনা বাক্য নিয়ে চিঠি আসতে লাগল। তাতে আমি, বিমান অনেকটা শান্তি পেলাম কিন্তু কেউ আমাদের রিলিজ করতে আসেনি কিংবা রিলিজের ব্যবস্থাও করেনি। তবুও আশায় বসে রইলাম, এখান থেকে অতিসত্বর ছাড়া পাব। এক দিন দুপুর বেলায় বাইরে থেকে দরজায় টোকা দেওয়ার আওয়াজ পেয়ে দেখি আলাউদ্দিন ভাই একটা চিঠি হাতে

নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি দরজা বন্ধ করে রান্না করছিলাম। বিমান দরজা খুলে বলল, দ্যাখ, কে এসেছে। আলাউদ্দিন ভাই চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, দিদি ধরুন কমরেড নারায়ণ বিশ্বাস চিঠি দিয়েছেন। আমিতো অধীর আগ্রহে উনার হাতের চিঠিটা নিয়ে উনাকে ধন্যবাদ দিলাম। উনিও খুশি হয়ে বলল, কি লিখেছে পড়ুন। আমি চিঠি খুলে বললাম, আমি তো জানি উনি কত বড় মাপের মানুষ। উনার আদর যত্নের কোন তুলনাই হয় না।

চিঠিটা হুবহু তুলে ধরলাম-

ট্রেন থেকে

২৫.০৮.১৯৭১

পরমস্নেহাস্পদসু

তোমার খবর পাওয়ার আগেই ওখানে রওনা হয়ে রাস্তায় আটকেছিলাম। জিনিসপত্র সব রাস্তায় রেখে কলকাতা এসে তোমার টেলি ও চিঠি পেলাম আমি ট্রেন থেকে তোমাকে Wright tele দিয়েছি। আমি তোমার ওখানে অনিশ্চয়তার (বন্যার জন্য) মধ্যে রওনা হয়েছি। রাস্তায় ২/৪ দিন আটকে থাকতেও হতে পারে। যেমন করে পারি তাড়াতাড়িই আসছি। টাকা পয়সা বা কোন জিনিসেরই অভাব আমি হতে দিব না। কেবল তোমার কাছে যেয়ে পৌঁছুতে যা দেরী হবে। ভালোবাসা নিও ও বিমানকে দিও। সামনা-সামনি সব কথা শুনবো ও বলবো। খুব সাবধানে থেকো।

ইতি

তোমার কাকা

তোমার চিঠি পাওয়ার আগেই তোমার দিদির সাথে দেখা করেছি।

Sreemati Shephali Das	**From**
C/O Md. Alauddin	Narayan Biswas
C.P.I. Office	Durgapur
P.O. Mahendraganj.	
(Garoo hill)	

চিঠিটা পড়ার পর আলাউদ্দিন ভাই খুবই খুশি হলো, আর এখনতো দিদির কোন চিন্তাই নেই। মনে হচ্ছে যেন বাড়ি ফিরে যাবেন। কাকাকে পেয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না। আমি আলাউদ্দিন ভাইকে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘরে আসতে বললাম। এখন আলাউদ্দিনের এত আদর কেন দিদি? বললাম, আদর হবে না আলাউদ্দিন যে ভাল লোক। ভাল লোকের আদর সর্বত্র, যতদিন বেঁচে থাকবো, আপনাকে ভুলতে পারবো না। তাছাড়া আমরা তো চিরকাল এখানে থাকতে আসিনি, কলকাতা গেলে, সারা বাংলাদেশের প্রতিনিধি ও মন্ত্রী উচ্চ পদস্থ বহু ব্যক্তির সংস্পর্শ আমি পাবো সেজন্য মনটাও ভাল। যাবেন না ভাই, চা খেয়েই যাবেন।

কাকার চিঠি পেয়ে কত যে আনন্দ পেয়েছি, তা আর বলে শেষ করা যাবে না। আমার নিজের কাকা, আমার বাবার আপন ভাই প্রমথ বিহারী দাসকে বাবা কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়েছে নিজের টাকা খরচ করে এবং কাকা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে অফিসার্স ব্যাংকে উচ্চ পদে চাকরি করতেন। এখন অবসর প্রাপ্ত শুধু তাই নয়, আমার কাকিমার ভাই আমাদের ঘারিন্দার ও টাঙ্গাইলের বাসায় থেকে করটিয়া সা'দত কলেজে পড়েছে। আর আজ যখন আমরা মহাবিপদে পড়েছি, তখন দুনিয়ার কেউ কারো নয়। কাকা আমার এমন একটা চিঠি লিখলেন, যেটা পড়ে অন্তরাত্মা জুড়িয়ে যায়। লিখলেন ‘আমি বৃদ্ধ, আমি অথর্ব, আমি কপর্দকহীন, আমার করার কিছুই নেই। অন্যান্য শরণার্থীর ভাগ্যে যা আছে, সেটাকেই ভাগ্য মেনে নাও।’ আমি সত্যি সত্যি সেটাকেই ভাগ্য মেনে নিয়েছি। আর ভেবেছি, বিপদে বন্ধুর পরিচয়। অন্য আত্মীয়রাও চিঠি লিখেছে সহমর্মিতা ও সহানুভূতির ভাষায় কিন্তু কেউ নিতে আসেনি। যাই হোক নিজেদের জীবন নিয়ে চিন্তা করি না, কারণ প্রাণটুকু হাতে নিয়ে বেঁচে উঠে আমরা দু’ ভাইবোন ইন্ডিয়াতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই এবং আমাদের একটা না একটা গতি হবেই।

১৫ শ পর্ব

সঙ্গে করে যে কয়টা টাকা পয়সা নিয়ে এসেছিলাম, তাও প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর শরণার্থীদের যে চাল দেয় তা আতপ ও বিস্বাদ। কি আর করব পেটের জ্বালায় বিস্বাদ খাবারকে অমৃত বলে মুখে তুলে দিতে হয়। পূর্ববঙ্গের লোকেরা ক্ষেতের ধানের ঢেঁকিছাটা সুগন্ধ চাউলের ভাত খেয়ে অভ্যস্ত। তবুও এটা খেয়েই ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হচ্ছে। আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। রুক্ষ, গরম আর মাঝে মাঝে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। অপরিচিত লোকজন, কথা বলার মত লোকও নেই। এর মধ্যে পাহাড়ী এক বুড়ি মাঝেমাঝে সমতলে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করতো। মহিলাটি আধা বাংলা আধা আদিবাসী ভাষায় কথা বলতো, তাতে ভাল করেই তার ভাষা বুঝতে পারতাম। বৃদ্ধ মহিলাটি মহেন্দ্রগঞ্জ হাসপাতালের একজন নার্সের দিদা। নার্সের একটি মেয়ে আছে। তার দেখা শুনা করে, মহিলার দোজবরে বিয়ে হয়। নার্স নাতনীর মা যখন ছোট তখন দিদাকে বিয়ে করে আনে ওর দাদু। কয়েক বছর যাওয়ার পর নার্সের দাদু মারা যায়।

আর বুড়ি ওর সৎ মেয়েকে বিয়ে দেয়। সেই ঘরেই নার্স। একদিন নার্সের মাও মারা যায়। বুড়ি নার্স ও তার ছোট মেয়েটাকে নিয়ে থাকে। বুড়ি খুবই আলাপী এবং মিশুক। বুড়িটি মাঝে মাঝে কলাটা, মূলোটা, পেয়ারাটা খাওয়ার জন্য হাতে করে নিয়ে আসত এবং আনলে তখনই তার সামনে যেতে হতো। খুব আবেগ প্রবণ, না খেলে রাগ করত। যেদিন বুড়ি নিচে নেমে না আসত সেদিন আমার একটুও ভাল লাগত না। বুড়ির নাতনীর বাচ্চাটি দেখতে বেশ মিষ্টি টুকটুকে ফর্সা বোঁচা বোঁচা নাক, ফুলো ফুলো গাল ও চোখ। সর্বদা হাসি হাসি মুখ-খুব ভাল লাগে। বুড়ি আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত, বাড়িতে কে কে আছে? বিয়ে করেছি কিনা? কেন করেনি? এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করত। যার উত্তর দিতে আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। নানা চিন্তা ভাবনায় এত বিচলিত থাকি যে, সর্বদা মনটা অশান্তিতে থাকে। মাঝেমাঝে আলাউদ্দিন ভাইয়ের বাড়ি যাই, ওখানে খালাম্মার সঙ্গে দেখা হয় এবং আলাপচারিতায় একটু ভালই লাগে। দেশের জন্য আত্মীয় স্বজনের জন্য দেশের একটি লোকজনের জন্য সর্বদা খুব উদ্বিগ্ন থাকি। বাড়ির মালিকও খুব ভাল ছিল। কাকার চিঠি পেয়েছি এ কথা শুনে মালিকও খুব খুশি হলো। সত্যি সত্যিই একদিন ভর দুপুরে নারায়ণ কাকা এসে হাজির হলেন। আমি ও বিমান তখন খেতে বসেছি। কাকাকে দেখেই তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে পড়লাম। কাকা কাঁধ থেকে বোচকা নামাতে নামাতে বলল, একি করছ। তোমরা খাও, এগুলো তো আমিই করতে পারবো, কার কথা কে শুনে, বিমান হাত ধুয়ে কাকাকে বসিয়ে উনার আসা জিনিসপত্র ঘরে তুলতে লাগল। উনি যে এত সংসারী তা আমার আগে জানা ছিল না। বিছানাপত্র, থালা বাসন, রান্নার হাঁড়ি পাতিল, গ্লাস, বাটি, চায়ের কাপ, চামচ ইত্যাদি ও শতদিনের হাজার হিসাব করে এনেছেন। দেখি কাকা ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কুয়োর পারে নিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে এসে কাকাকে খেতে দিলাম। সেই মানুষ নাকি উনি যে আমাদের রেখে খেতে বসবেন। বলল, আমি খেয়ে এসেছি, তোমরা খেয়ে নাও।

আমি পরে খাব। তাই কি কখনও হয় বাড়িতে এতদিন পর পিতৃতুল্য অতিথি রেখে আমরা খেতে বসব। তার চেয়ে এক কাজ করি ঘরে চাল আছে খানিকটা ভাত রেঁধে নেই। তারপর তিনজনে একসঙ্গে খাবো। কাকা বলল, শুনবে না যখন তাই কর। আমি তাই করলাম এবং রান্না শেষ করে তিন থালায় ভাত বেড়ে নিলাম। রান্নার আইটেম তেমন কিছু নয়, করলা ভাজি, একটা শাক ও রেশনের ডাল। এ কয়দিন এরকম খেতে খেতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আর কাকা তো নিরামিষ ভোজী। কাকাকে কয়েকটা কাঁচামরিচ দিলেই খুব খুশি।

পরের দিন কাকা বাজারে গিয়ে আমাদের জন্য মাছ নিয়ে এলো। ছোট মাছ, যা কাটতে মুশকিল। কাকা বলল, বাড়ির মালিকের কাছ থেকে একটা বটি এনে দাও আমি কেটে দিচ্ছি। আমি বললাম, না আমার তরকারী কাটা বটিতেই হবে। আর কোন দিন মাছ আনবেন না। কাকা আমার উপর খুবই বিরক্ত হলেন এবং বললেন, জামালপুর থেকে মহেন্দ্রগঞ্জ আসার পর এক টুকরো মাছ কি পেটে গিয়েছে? লক্ষ্মী মা এমন করো না, আমাকে শান্তি পেতে দাও। বললাম, কাকা এখন আপনাকে পেয়ে আমাদের কোন দুঃখ নাই, যার হাত ধরে আদরে যত্নে চলতে হবে সে তো এসেই গেছে। আমাদের এতটুকু চিন্তা ও দুঃখ নেই। কাকা এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তাই না মা তাই চিন্তাও নেই দুঃখও নেই। তাই যদি হয় মা তবে কাকাকে দেখো। যত্ন করো। বললাম, আপনার স্নেহছায়ায় আমরা প্রত্যেকটি ভাই-বোন স্নেহধন্যা। আপনাকে তো অবশ্যই দেখবো। একদিন বললেন, তোমরা এলে, কল্যাণটাকে সাথে করে আনলে না কেন? ছোট মানুষ, কি করে কি করবে? আমি বললাম, মা আসতে দিল না। বলল, ছোট মানুষ, থাক আমার চোখের সামনে থাক। বৌদি কি একটু বেশি বুঝল না? কিছু হলে উনি কি বাঁচাতে পারবে? আমি বললাম, হাসান আলী নামে আমাদের পাশের বাড়ির এক রাজাকার আছে তার প্রতি মায়ের অগাধ বিশ্বাস। মায়ের পরিবারের কোন ক্ষতি হতে দিবে না রাজাকাররা। এই ভরসায় মা কল্যাণকে আমাদের সাথে পাঠালো না। কাকা খুব রাগ করল।

এমন ট্যালেন্ট ছেলেকে আগে পাঠানো উচিত ছিল। আর রাজাকারদের মানুষ বিশ্বাস করে। আমি বললাম, জামালপুর এসে যে অমানুষিক কষ্ট এবং মহেন্দ্রগঞ্জে যে খাওয়া শোওয়া সবদিকেই কষ্ট করতে হতো এত আদরের ভাইটি পারত না কষ্ট সহ্য করতে। কাকা দেখল যে একটা কুপী দিয়ে সন্ধ্যাটুকু কোন রকমে পার করে দেই। এটা নিয়েও আমার উপর রাগ করল। আমি বললাম, কাকা, আমার হাতে কোন টাকা পয়সা ছিল না। কি করে কি করব। হেড মিস্ট্রেস সমস্ত টাকা আটকে দিয়েছে। ভিক্ষে করে, পরার কাপড় বিক্রি করে মাত্র ৩৫০ টাকা হাতে নিয়ে এসেছি এবং ওর মধ্য থেকে ৬০ টাকা মাঝিকে দিতে হয়েছে। আপনার আসার আগ পর্যন্ত খেতে হয়নি? কাকা আমাকে থামিয়ে বলল থাক থাক এ কথাগুলো আমার বলা ঠিক হয়নি। তুমি যে কেমন হিসাবি মেয়ে অজানা নয়। যাক দুঃখ করোনা বলে বাজার থেকে হ্যারিকেন ও কেরোসিন, বিমানের জন্য দু'টো লুঙ্গি ও আমার জন্য একজোড়া শাড়ি নিয়ে এলো। যাক তাও লজ্জা নিবারণের উপায় হলো।

১৬ শ পর্ব

কাকা আমাকে ও বিমানকে চুপিচুপি বলল যে, খুব চুপচাপ থাকবে এখানকার অনেকেই SPY গিরি করে। তাই ভেবেচিন্তে চলবে ও কথাবার্তা বলবে। ওরা একটা কিছু পেলেই সেটা নিয়ে নানা জটলার সৃষ্টি করে। আমি যাওয়ার ব্যবস্থা করছি, যেভাবেই পারি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করবো, কাকা যদি না আসতেন তা হলে আমাদের রিলিজ করা হতো না। উনারও তো বয়স হয়েছে, ৭০ বছরের বৃদ্ধ। তারও তো চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। আমরা সেটাও বুঝি। তাই সেরকম কোন চাপ সৃষ্টি করি না। এদিকে কাকা আস্তে আস্তে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, আমরা একদিন সকালে আলাউদ্দিন ভাই, মুকুল, কামাল ও খালাম্মার সঙ্গে দেখা করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ওখান থেকে কিছু খেয়ে আসিনি, কাকা বলল, রাস্তায় খেয়ে নিবে। ওখান থেকে আমরা বাসে উঠে রওনা দিলাম। বাস জার্নি যে এত খারাপ এখানে বাসে না উঠলে বুঝতে পারতাম না। পাহাড় কেটে কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছে। দৃশ্যগুলো দূর থেকে দেখতে ভারী সুন্দর। খানিকটা রাস্তা বেশ উপর দিকে উঠে আবার নিচের দিকে নেমে গেছে। এইভাবে চড়াই উৎরাই হতে হতে সমতলে এসেছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু কিছু খেতে পারছি না। মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বমি হয়ে পড়ে যায়। যাই হোক এভাবে রোগী নিয়ে যাত্রা বিরতি দেওয়াই শ্রেয়। এভাবে মেয়েকে মেরে ফেলতে তো পারি না। মেয়েকে বাঁচাতে এসে যদি মেরেই ফেলি, তা হলে কষ্ট করে লাভ কি? কাকা আমাকে ও বিমানকে নিয়ে ধুবরী এসে এক হোটেলে উঠল। ওখানে এসে ভাল করে স্নান করে ঘরে পাখা ছেড়ে দিয়ে খাটে বসে আরাম করছি। বিমান বলল, শেফুদি শুয়ে পড়, কি খাবি বলত? কাকা বলল, আসার সময় দেখলাম ভাল শরবত পাওয়া যাচ্ছে। যা তিন গ্লাস শরবতের অর্ডার দিয়ে আয়। সত্যিই শরবতটা খেয়ে খুব আরাম পেলাম, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে উঠে পড়লাম। কাকা জিজ্ঞেস করল, ভাল লাগছে? বললাম, হু। একটু বাইরে ঘুরে আসবে? আমি বললাম, কোথায়? পাশে একটা মন্দির আছে, চল ওখানে ঘুরে আসি। আমি মনে মনে ভাবলাম, এতো দেখি ভূতের মুখে রাম নাম। কোনোদিনও টাঙ্গাইল কালীবাড়ি ঢুকতে দেখিনি। আর এখানে এসে একেবারে কালীভক্ত হলো। এই কমরেডের সবকটি চুল পেকে সাদা হয়েছে। উনিই আমাকে বলেছে ৩০ বছর জেল খেটেছেন এবং জেলে থেকে উনার সবকটা চুল পেকে সাদা ধবধবে হয়েছে। আর বিপরীত হয়েছে উনার দাঁত। দু'পাটি দাঁতই উনার শক্ত সামর্থ্য। কিন্তু সবকটা দাঁতই কালো কুচকুচে। চুল সাদা ধবধবে আর দাঁত কালো কুচকুচে। বললাম, কমরেড কবে থেকে কালীভক্ত হলেন, কাকা হাত তুলে থাপ্পড় দিতে দিতে বলল ইয়ার্কি হচ্ছে মেয়ে। এত কষ্ট করে বাঁচিয়ে আনলাম, তার এই প্রতিদান। আমি হাত জোর করে বললাম, ক্ষমা চাই বাবা, আর কিছু বলবো না।

সেদিনই বিমান ও কাকা দুজনে মিলে আমাকে কালী মন্দির দেখিয়ে নিয়ে এলো। খুব ভাল লাগল মন্দির ও মাকে দেখে পরের দিন সকালে আমরা খানিকটা বাসে ও খানিকটা ট্রেনে রওনা হলাম। আমরা ওখানে থেকে ফারাক্কা হয়ে আসতে পারতাম কিন্তু ফারাক্কায় বন্যা হওয়াতে ওখানকার রাস্তা বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের বারুনী থেকে ট্রেনে করে আসতে হচ্ছে। আমরা বারুনী স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। শুনতে পেলাম কে যেন আমার ডাক নাম শেফু, শেফু করে ডাকছে। এখানে অচেনা জায়গায় কে আবার ডাকবে, আমার শোনারই ভুল হয়েছে। হঠাৎ করে অনুভব করলাম আমার পিঠে যেন কে হাত রাখল। ফিরে তাকিয়ে দেখি শওকত তালুকদার ও পাশে শাহজাহান সিরাজ। বললাম শওকত ভাই। এখানে কীভাবে, বলল, তুই যেভাবে আমরাও সেভাবে; কমরেড চলুন কিছু খেয়ে আসি। কমরেড বলল, আমি কিছু খাবো না, যদি পারেন আপনাদের বোনকে কিছু খাওয়ান। আমরা কিছু খাওয়াতে পারি নি। শওকত ভাই আমার বড় ভাই-এর বন্ধু ছিল, সেই সুবাদে ছোটবোন হিসাবে নাম ধরে ও তুই তুকারি করে ডাকত। শওকত ভাই বলল, ভাঁড়ে চা খেয়েছিস কোনদিন? বললাম, হ্যাঁ এখানে এসে খেয়েছি। শওকত ভাই হেসে বলল, এটা ভারতের একটা ঐতিহ্য। আমরাও এখানে এসে প্রথম খেলাম।

১৭ শ পর্ব

এত ব্যস্ততম স্টেশনগুলো। কোন প্ল্যাটফরমে কোন ট্রেন, সারাক্ষণ গাড়ির ঝকঝকানি লেগেই আছে। আমরাতো এগুলো দেখে অভ্যস্ত নই তাই আমরা তালগোল পাকিয়ে ফেলি। কিছুক্ষণ পর দেখি যে ট্রেন দেখেছিলাম, সেটাও নেই, যে প্যাসেঞ্জার দেখেছিলাম, তারাও নেই। ভীষণ গোলকধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে গেলাম, তারপর একটা ট্রেন এলো দুই নম্বর প্ল্যাটফরমে। একটা সিটও খালি নেই, যাত্রীরা পায়ে পা রেখে দাঁড়িয়ে। গাড়ির প্যাসেছে আমাদের বাক্স পেটরা বেডিং সমস্ত রেখে তার উপরে আমাকে বসিয়ে দিলো। গাড়িতে প্রচণ্ড গরম, দম ফেলানোর উপায় নেই। এমন সময় কাকা গাড়ি থেকে নিচে নামল। আমি তো কিছুই চিনি না, এমনকি টিকিট করা প্ল্যাটফরম চিনে ট্রেনে ওঠা। মনে মনে চিন্তা করছিলাম, এখন যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় তাহলে কি হবে। যাক আমার অস্থিরতার অবসান হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাকা ফিরে এলো। এসে দেখতে পেল যে এক হিন্দুস্তানি মহিলা আমার গাঁয়ে বার বার পড়ছে। কাকা মহিলাকে বলল, তুমি দেখতে পাচ্ছ না মেয়েটার গায়ে বারবার পড়ছো? মহিলা চেঁচিয়ে বলল, হ্যামি কি করব? তোমহার লাড়কির দরদ আছে হামার দরদ নেই? মহিলার চেঁচিয়ে বলার ভাব দেখে কাকা বলল, আমার লাড়কির দরদ আমার কাছে তো থাকবেই। আমার লাড়কি বাদ দিয়ে তোমাকে দরদ দেখাবো? আমি বললাম, কাকা আর ঝগড়া করে কাজ নেই, আমার খুব খারাপ লাগছে।

তার পরের কথা আমার একটুও মনে নেই। আমার যখন জ্ঞান ফিরেছে তখন মনে হচ্ছিল সমুদ্রের ওপার থেকে কে যেন আমাকে দিদি দিদি মা- মা বলে ডাকছে, আস্তে আস্তে আমার জ্ঞান এলো। আমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে প্ল্যাটফরমে নিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে বিশ্রামাগারে রেখেছে। সারারাত ওখানে থেকেছি, তারপর বোলপুর আমার ট্রেন ধরে ওখানে আসতে হবে। এত ভাল, এত দরদী গাইডার কাকা যদি না থাকত তাহলে আমাকে রাস্তায়ই মরে পড়ে থাকতে হতো। কি সুন্দর স্টেশন, কি সুন্দর বন্দোবস্ত। সবকিছু নিয়ম শৃঙ্খলা মাফিক চলে। সব ভাল হলে কি হবে ট্রেন থেকে শুধু আমাকে নামানো হয়েছে। বাক্স পেটরা বিছানা পত্র ও অন্যান্য জিনিস কিছুই নামানো হয়নি। আবার শোকের মুখে শুনলাম স্টেশনে এসে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন সঙ্গে তার ছেলে ও স্ত্রী ছিল তারা নদীতে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে। কলকাতায় এসে শুনলাম নগেন্দ্র নাথ ওখানে মারা গেছে। কাকা জোর করে হাত ধরে বসে রইল যাতে উঠতে না পারি, জোর করে হলেও নাস্তা খাওয়ালো। ওরাও নাস্তা খেয়ে ট্রেনের উদ্দেশ্যে গেলাম। ওখানেও সিট নেই কিন্তু ভদ্রলোক ছিলো। কতকগুলো যুবক ছেলে উঠেছিল, ওরা ট্রেনে বসে তাস খেলছিল। ওদের ব্যবহার, চাল চলন সবই ভদ্রোচিত। জায়গা নেই। শরীর দুর্বল, দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। তাই কাকা আমার জন্য জায়গা চাইল ওদের কাছে। কাকা ইংরেজিতে বলছে বলে ওরা বলল, আপনি বাংলাও বলতে পারেন আমরা বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি তিনটা ভাষা ভাল বলতেও পারি এবং ভাল বুঝিও। তারপর ওরা একটু এগিয়ে এসে আমাকে পিছনের দিকে শুতে দিলো। আমিতো শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্লান্ত শরীর। দুপুর হওয়ার সাথে সাথে ট্রেনের ছেলেগুলো উঠে হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেতে তৈরি হলো। কাকা আমাদের খাবার একটু দেরীতে দিতে বলল। আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসতে বলল, আর আমি মনে মনে ভাবলাম এ কেমন মেয়ে। বাড়ির পুরুষ ও গুরুজনদের যত্ন আত্তি করবে, তা না করে নিজে আদর যত্ন ভোগ করছে। ভীষণ লজ্জা লাগছিল। শরীর এত দুর্বল যে আমাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিতে হয় আনতে হয়। এই কাকাই আমাকে শিখিয়েছে মানুষে মানুষে ভালোবাসা করতে। ছোটদের অপরিসীম স্নেহ আদর যত্ন করে মানুষ করতে। উনার সঙ্গে আমার আত্মীয়ের বন্ধন, রক্তের সম্পর্ক, সামাজিকতার কোন সম্পর্কই ছিল না, ছিল শুধু আত্মার টান-বন্ধন। যেটা আমরা ইচ্ছে করেও ছেদ করতে পারিনি। কাকাই আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা সংগ্রহ করে। ইন্ডিয়াতে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। তার ভাষায় ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এখানে মানুষ তো কোন ছাড়। স্নেহের বন্ধনে এমনভাবে বেঁধে রেখেছিলেন। যেটা ছিল অটুট। আমার সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, এই কাকা, আমার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আমি কোনদিনও কারও কাছ থেকে এত স্নেহ, এত আদর যত্ন, এত ভালোবাসা পাইনি। আমি যখন কারও কাছ থেকে দুঃখ পেয়ে ব্যথা পেয়ে বাড়ি এসে কান্না শুরু করতাম তখন কাকা দুই হাতের তালুতে গাল দুটি ধরে বলত, কি বোকা মেয়েরে। কে কি বলল আর না বলল, বুঝে না বুঝে কান্না আরম্ভ করল। মা এসে কাকাকেই বকতে লাগল, আপনার আহ্লাদেই এমনটা হয়েছে, এখন ঠেলা সামলান, কাকা রাগ করে উত্তর দিত কি ঠেলা সামলাবো? ও ছোট মানুষ কতটুকুই বা বুঝে? একদিন আমার এই ছোট্ট মেয়েটা ভাল মানুষের সন্ধান পাবে। আমি তাকে বলে দিব, আমার মেয়েটাকে অবহেলা না করতে আমারও অর্ধেক তাকে ভালোবাসতে।

১৮শ পর্ব

সারারাত ট্রেনে করে এসে সকাল ৭ টার সময় বোলপুর এসে পৌঁছলাম। আমার মেজদি মুকুল ধর থাকত বোলপুর সংলগ্ন আদিত্যপুর গ্রামে। মেজদি আদিত্যপুর গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করত। ওখানকার বাড়িগুলো মনে হয় রাস্তার গাঁ ঘেঁষে তৈরি হয়েছে। মেজদি একটি ছোট বালতি হাতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা সেদিকে দেখে ডাকলাম। ডাক শুনে মেজদি দৌড়ে এলো এবং রিকশাওয়ালা দিদির বাড়ির সামনে নিয়ে এসে জিনিসপত্র নামাতে লাগল। কাকা মেজদির হাত দুটি ধরে আমাকে ও বিমানকে উনার হাতে দিয়ে বলল, পাখীর বাচ্চাকে যেমন করে ঠোঁটে করে নিয়ে আসে, আমিও তেমনি করে আমার বাচ্চা দুটিকে অতি যত্ন সহকারে ঠোঁকে করে এনেছি, এতটুকু ক্ষতি হতে দেই নি। এ কথা বলেই উনি যে রিক্সায় এসেছিল সে রিক্সাতেই ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। কাকা বলল, কলকাতায় আমার ভীষণ জরুরী কাজ আছে। পরবর্তীকালে আমি খবরাখবর করব। এই কথা বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কাকা কলকাতা চলে যাওয়ার পর আমরা মেজদির বাসায় দু'তিন দিন থাকলাম। তখন আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুব খারাপ। মেজদি বোলপুরে আমাকে ডাক্তার দেখাল এবং জামা-কাপড়, পায়ের স্যান্ডেল কিছুই তো ছিল না। দিদি ওগুলো কিনে দিলো। তাছাড়া বুদ্ধি হবার পর এই প্রথম কলকাতা যাচ্ছি। কাজেই কলকাতা সম্বন্ধে আমার তেমন কোন বাস্তব ধারণা নেই। জামাইবাবু বলে দিল তোমরা এক্সপ্রেস গাড়িতে যেওনা ভীষণ ভিড় হয়। রামপুর হাটে যেও। সেটা ব্যান্ডেল থেকে এক্সপ্রেস হয়ে হাওড়া যাবে। মাত্র ২ টাকা ভাড়া। আমরা রামপুর হাটে সকালে বোলপুর থেকে রওনা দিয়ে বেলা ১১ টার দিকে হাওড়া গিয়ে পৌঁছলাম। ওখান থেকে ভুবন ব্যানার্জী লেনে জামাইবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠলাম। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে জামাইবাবু বীরেশ্বর ধর আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। জামাইবাবুর সঙ্গে এই প্রথম আমাদের দেখা হল। শুরুটা ভালই লাগল। রাজাকার ও পাকবাহিনীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাবা-মা, কমলদি, সোনালী, বিধান ও কল্যাণকে নিয়ে আকালু মন্ডলের নৌকায় মানকার চর এসে পৌঁছেছে। ওখান থেকে বাবা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদের কাছে চিঠি লিখেছে। জামাইবাবু আমাদের সামনে এসে বলল, বাবা তাদের গ্রামের এক ভদ্রলোকের কাছে চিঠি লিখেছে তোমরা আমার ঠিকানায় উঠেছ, তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়ি এসেছিল। লোকটির নাম ভূপেশ গুপ্ত, আদি বাড়ি ঘারিন্দা। সে তোমাদের একশত টাকা দিয়ে গেছে এবং আবার আসবে বলে গিয়েছে। উনি যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক। দু তিন দিন পর মেজদি আমাদের জামাই বাবুর বাসায় রেখে তার কর্মস্থল বোলপুর চলে গেল এবং তার দু'তিন দিন পর কাকা ভুবন ব্যানার্জী লেনের বাসায় আসল।

আমরা ঐ বাসা থেকে কাকার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে লাগলাম। কাজের সন্ধানে জামাইবাবুর বাসা থেকে সকালবেলা বের হয়ে রাতে ফিরে আসি। জামাইবাবুর দিদি এসে বলল, তোমরা দুপুরে খাবে না তাতো বলে যেতে হতো। এখন এ ভাতের উপায় কি হবে? আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। চারটা ভাতের জন্য এত কথা, কিছু বললাম না, চুপ করে রইলাম। দিদি বলল, এরপর থেকে দুপুরে খাবে কি না খাবে বলে যাবে। কখনও কখনও এমন হতো দূরে চলে গিয়েছি ফিরতে দিরে হবে। তাই রাস্তায়ই খেয়ে নিয়েছি, সুতরাং প্রতিদিন সকালে বের হওয়ার সময় বলে যেতাম, আমরা দুপুরে আসব না, এরই মধ্যে কাকা আমাকে সেলিনা বানুর বাসায় নিয়ে গেল। কাকা বলল, তোমাকে বলেছিলাম এই মেয়েটির কথা, ওর নাম শেফালী দাস ও জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা হিসাবে এতদিন কর্মরত ছিল। বর্তমানে শরণার্থী। তিনি বললেন, ঠিক আছে থাক আমার সঙ্গে বিভিন্ন ক্যাম্পে শরণার্থীদের সেবা করবে। কাকা বলল, সে না হয় করবে কিন্তু ওর টাকারও দরকার ওর পরিবারবর্গ এখানেই চলে এসেছে।

তারা বিভিন্ন স্থানে থাকছে। সেলিনা বানু একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, দাদা সব হবে, আপনি চিন্তা করবেন না। কাকা তখন সেলিনা বানুকে বলল, একবার এম.পি. সাহেবের কাছে ওকে নিয়ে তুমি যাও আমার মনে হয় ওখানে তুমি একটা কিছু করতে পারবে। পরের দিনই সেলিনা বানু আমাকে মান্নান ভাই-এর বাসায় নিয়ে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কোন একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ জানাল। মান্নান ভাই উনার অনুরোধ রেখে আমার হাতে একখানা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওকে অডিশন দিতে হবে।

অডিশনে পাশ করলে ওখানে কাজ করবো। ঠিকানা, ৫৭/২ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। সেটাই ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অফিস। মান্নান ভাই বেতার কেন্দ্রের কর্তাও। ওটা পৌঁছে দেওয়ার দুই তিন দিন পর লোকটার সঙ্গে দেখা করলাম। উনি বললেন, আপনি পাশ করেন নাই। পাশ না করলে তো বাড়িতেই ফিরে যাওয়া উচিত। কাকা বলল, ওরা বললেই হলো। চল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি মান্নান ভাই কি বলেন। কাকা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মান্নান ভাই হেসে দিয়ে বলল, দাদা আপনি? কাকা বলল, এই মেয়েটাকে আপনার ওখানে নিয়ে এসেছি। এবার কাকার সঙ্গে সেলিনা বানুও এসেছে। কাকা বলল, অডিশনে নাকি পাশ করেনি, তাই ওকে রাখা হয়নি। মান্নান ভাই বললেন, আমি দেখি কি করা যায়। ওরাও বলল পাশ করেনি। মান্নান ভাই ফোনে সেই লোকটাকে বললেন, বেশ ফেল করেছে। আপাতত তাকে দিয়ে প্রোগ্রামটি চালাও কাল থেকেই, ওকে। প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে দাও। এ বিষয়ে তোমাদের কোন অমত আছে? কথা বলছ না কেন? বেশ তোমাদের কোন অমত নেই। দাদা যান এই চিরকুটটা ওদের হাতে দিবেন। আমরা তো পাবলিক সার্ভিসে চলাফেরা করে অভ্যস্ত নই। সেলিনা বানু বলল সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আবার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গেলাম এবং মান্নান ভাই-এর দেওয়া চিরকুটটা ওকে হাতে দেওয়া মাত্র যেন তেলে বেগুনে জ্বলে পুড়ে উঠল। লোকটা বলল, কালই তো আপনাদের বলে দিয়েছি আবার কেন

এসেছেন? কাকা বলল, ফোনে উনি বেতার কেন্দ্রে কথা বলেছেন এবং চিরকুটটা দেখুন। ভদ্রলোক চিরকুটটা হাতে নিয়ে দুঃখিত মনে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে কাল আসবেন।

আমরা ওদের ব্যবহারে খুবই মনঃক্ষুন্ন হয়েছি। আমরা বাড়ি ফিরে আসলাম। পরের দিন সেলিনা বানুর সঙ্গে আমি আবার স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র অফিস, বালিগঞ্জ এলাম। আমাদের দেখে একটু রাগ ও দুঃখমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি ভদ্রলোকটির সঙ্গে গেলাম, ঘরে কেউ নেই। চতুর্দিকে পর্দা দিয়ে ঢাকা, উনি আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে একটা কাগজ হাতে দিয়ে বলল, এটা জোরে জোরে পড়ুন। আমি কিছু বোঝার আগেই আমাকে পড়তে হচ্ছে, যখন প্রায় অর্ধেকখানি পড়া হয়েছে তখন আমি বুঝতে পারলাম, আমি কোন স্ক্রিপ্ট পড়ছি। পড়া শেষ হওয়ার পর কাগজটি আমার হাত থেকে নিয়ে নিল এবং আমাকে বলল, আগামীকাল এসে জেনে যাবেন আপনাকে রাখা হলো কিনা। এই কথা শুনে আমরা দুজন দুজনের মুখোমুখি তাকালাম এবং চলে এলাম। আমিতো কলকাতার কিছুই চিনি না। তাই উনারা আমাকে রাস্তা চিনানোর জন্য সঙ্গে আসেন। পরের দিন সেলিনা বানুর জরুরী কাজ থাকার জন্য তার মেয়ে মিথিলা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এই মিথিলা একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, আমি থাকতাম পার্ক সার্কাসে সেলিনা বানুর বাসায়। ওখানে আব্দুস সামাদ আজাদ পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ফ্যামিলি ও সেলিনা বানুর ভাগনির ফ্যামিলি বাস করত। তাছাড়া আমার মত বেশ কয়েকটা মেয়েও বাস করে। এইভাবে আমরা শরণার্থীর মত নিচে চাদর বিছিয়ে মেয়েরা একত্র শুতাম। আব্দুস সামাদ আজাদের টুকটুকে ফর্সা সুন্দর মেয়ে শিল্পী ও ভাগনের মেয়ে ঝিনুক দুজনেই আমার নেওটা হয়ে উঠল। বেতার কেন্দ্রে যাবো বা অন্য কোথাও যাবো সেটা ওদের পালিয়ে যেতে হবে। ওরা আমাকে আপা বলে ডাকত। আর এত আপন ভাবতো যে ওরাও কোথাও যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যেতে চাইত।

১৯শ পর্ব

দুপুরে সেলিনা বানুর ঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, তখন শিল্পী ও ঝিনুক একজন আমার পেটে ও আর একজন বুকে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। এমন সময় বরিশালের বিখ্যাত মহিলা মনোরমা মাসীমা ঐখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর মেয়েদের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন এবং হাত দিয়ে ওদেরকে আমার উপর থেকে টেনে নামাচ্ছেন। ওরা একটু রাগ করেই আমার উপর থেকে নেমে গেল। ওদের দু'জনের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম কেমন ব্যথাতুর। আমি তো কোনদিনও এই ভদ্রমহিলাকে দেখিনি। সেলিনা বানুই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনি স্বনামধন্য বরিশালের মনোরমা মাসীমা। আমি উঠে উনাকে প্রণাম করলাম। উনি মায়ের মত আমাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমা খেলেন। অনেকদিন পর আমিও মায়ের আদর পেয়ে মাসীমার বুকে লুটিয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমিও সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মাসীমা আমার মুখটা ধরে বলল, খাসনি এখনও মুখটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে। আমি বললাম, মাগো তোমার এ মেয়ের মুখখানা বরাবরই শুকনো। কথাটা শুনে সেলিনা বানু একটু হাসল।

সেলিনাবানুর বাসায় নিত্য নূতন আসবাবপত্র ও বাসনপত্র আসতে লাগল। সেলিনাবানু এক মহিলাকে আমার সামনে এনে বলল, দেখতো উনাকে চিনিস কিনা? আমি চিনতে পারলাম না। তখন উনি বললেন আমার নাম অঞ্জলী আমার বাড়ি টাঙ্গাইল পলাশতলীতে। বাবা উকিল সুবেন ঘোষ। আমি বললাম চিনেছি। আপনার দিদির নাম ছবি দত্ত, উনার স্বামীর নাম বিনয় দত্ত। আরফান খান-এর টিজিটি কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন। হ্যাঁ আমি আপনার বাবাকে ও আপনাদের বাড়িও চিনি। তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। পাশের বাড়ির শিক্ষক কুমুদ চক্রবর্তীর বাড়ি প্রায়ই যেতাম। উনার নাম ও আমার বাবার নাম এক। বাবার নাম কুমুদ বিহারী দাস। কুমুদ চক্রবর্তীকে আমরা জ্যাঠামশাই, উনার স্ত্রীকে বড়মা বলে ডাকতাম। উনার একখানা বোন ছিল তাকে পিসীমা বলে ডাকতাম। পিসীমা কথা বলতেন বেশি তবুও তার মধ্যে খুবই আন্তরিকতা ছিল। আমি উনাদের পরিচিত বুঝতে পেরে অঞ্জলীদিও খুব খুশি হলো।

সেই বৃটিশ আমলের বান্ধবী উনারা এক সঙ্গে কলকাতায় লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে পড়েছেন। বান্ধবী এসেছে জেনে খোঁজ নিয়ে বান্ধবীরা কেউ খাট, কেউ ড্রেসিং টেবিল, কেউ সোফাসেট, কেউ কেউ টুল ইচ্ছামত দিয়ে গেছে। কেউ বা শীতল পাটি, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান রান্নার জিনিসপত্র ইত্যাদি দিয়ে তারা শরণার্থী বান্ধবীকে সাহায্য করেছে। আমার বড়দাদা কানন বিহারী দাস, ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। যখন আমরা কলকাতায়, দাদা তখন পাঞ্জাবে, দাদা বাংলায় কোনদিনও বদলী হয়ে আসে নাই। বড়দা ভাবল এই সুযোগে যদি বাংলায় বদলি হতে পারি, তাই আবেদন করল। বড়দার আবেদন মঞ্জুর হল এবং মোমেনপুর অরডিন্যান্স ডিপোতে কোয়ার্টারও বরাদ্দ করা হল। আমরা সেখানে গিয়ে

কোয়ার্টার দেখে খুশি হলাম। ঘর-দোয়ার আসবাবপত্র সবই ভাল। শুধু ওখানে বাঙালি নেই। বাংলায় বসে অবাঙালির সাথে বসবাস করতে হবে।
তাই হবে আর কি করা যাবে। কাকার ক্লাসমেট বুদ্ধদেব বসু কাকাকে বলল, আমার তো আস্ত বাড়ি নারকেল ডাঙ্গায় পড়ে রয়েছে তুই ইচ্ছে করলে ওদের ওখানে রাখতে পারিস বাসার রাঙ্গাদা বিজলী বিহারী দাস বলল, না ও বাড়ি হবে না। কারণ ওর পাশের বাড়িটাই নকশালরা দখল করে রেখেছে। ওখানে মেয়েছেলে নিয়ে বসবাস করা মুশকিল। কাকার আর এক ক্লাসমেট ভূজঙ্গ ভূষণ রায় চৌধুরী উনার আর একটা বাড়ি কলকাতার শহরতলীতে আছে সেটা দিয়ে দিলেন আমাদের বাস করার জন্য। বাংলাদেশ থেকে সবাই চলে এসেছে একটা বাড়ির তো অবশ্য দরকার। রাঙ্গাদা বিধানকে এক দোকানে সামান্য বেতনে চাকরি দিয়ে দিল। নিজেও এক দোকানে থাকে আমি তখনও সেলিনা বানুর বাড়িতেই আছি। এর মধ্যে কাকা একদিন আমাকে নিয়ে আকাশ বাণী ভবনে গেলেন। সেখানে মি. বি.সি. কর অল ইন্ডিয়া রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ইনচার্জ এর কাছে নিয়ে গেলেন আর আমাকে বললেন, ওখানে আমাদের লোক আছে মি. কাউল, উনি হলেন ইন্ডিয়ার ইন্টেলেকচুয়াল ব্রাঞ্চ-এর লোক। তুমি আমার নাম বলো এবং তোমার অভিযোগ জানিও তাতেই তোমার কাজ হবে।
আকাশ বাণীতে মহিলা আসরে নির্মলাদি শরণার্থী হিসাবে আমার একখানা সাক্ষাৎকার নিলেন এবং বললেন, আগামীকাল মহিলা আসরে এটা প্রচার হবে, শুনবে। আত্মীয়-স্বজন যারা আমাদের জায়গা দেয়নি তাদের প্রোগ্রামটা শোনার জন্য বললাম। পরের দিন সেলিনা বানুর বাসা থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাওয়ার সাথে সাথে একলোক এসে বলল, আপনাকে না কালকে বলে দিয়েছি, আজ থেকে আসবেন না, তাও এসেছেন। আমি বললাম, এম.পি. কেন্দ্রের পরিচালক মান্নান ভাই। যে পর্যন্ত উনি না করবেন, সে পর্যন্ত আমি আসতেই থাকবো।
একটু পরে সাংবাদিক কামাল লোহানী আর একজনের নাম ভুলে গেছি। যিনি উর্দু সংবাদ পাঠক ও পাকিস্তানি উর্দু সংবাদ থেকে বাংলায় তর্জমা করতেন। উনারা আমাকে বসতে বললেন এবং আরও বললেন তুমি যে সংবাদ পর্যালোচনা পাঠ কর তা কি রেডিওতে শুনেছ? চমৎকার পাঠ কর তুমি, তোমার উচ্চারণ ও বলার ভঙ্গি খুবই চমৎকার। ইন্ডিয়ার এক ভদ্রলোক আমাকে বলল, ইন্ডিয়ার মেয়ে দিয়ে এটা করাচ্ছেন নাকি? ভারী চমৎকার হয়েছে। প্রশংসা শুনে আমি খুবই খুশি হলাম, প্রশংসা শুনে কে না খুশি হয়। মোস্তফা মনোয়ার সাহেবের সঙ্গে ওখানেই দেখা হলো উনিও প্রশংসা করল। গানের মহিলা শিল্পীদের সাথে শুধু দেখা নয় আলাপও হতো। সাংবাদিক কামাল লোহানীর স্ত্রী দীপি লোহানীর সঙ্গে ওখানে কথাবার্তা হতো। হাসান ইমাম ও তার মন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা কথাবার্তাও হতো। আমাদের টাঙ্গাইলের নাট্যকার মামুনুর রশীদের সঙ্গে দেখা হলো। সাংবাদিক আমীর হোসেন আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমি যার সংবাদ পর্যালোচনা প্রতিদিন পাঠ করি। সপ্তাহে মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিনই সংবাদ পর্যালোচনা পড়ি। সাংবাদিক আমাকে বসতে বলে বললেন, প্রথম দিন ভয় পেয়ে গিয়েছিলে কেন?

-ভয় পাইনি, হাতে লেখা স্ক্রিপট একবার না পড়তে দিয়ে, প্রথম বারেই বলল পড়, তাই একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছিলাম। তবে আমি সব মানিয়ে নিয়েছি। দেখেছেন তো পরের সবগুলো ভালই হয়েছে। সাংবাদিক সাহেব বললেন, সত্যি সুন্দর হয়েছে। তখন থেকেই আমি স্বাধীন বাংলায় সংবাদ পর্যালোচনা পাঠ করছি এবং সেলিনা বানুর সঙ্গে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে যাচ্ছি ত্রাণ বিতরণের জন্য। একদিন সেলিনাবানু আমায় নিয়ে গেলেন তখনকার এক নামকরা ব্যারিস্টারের বাড়িতে। ব্যারিস্টারের নাম গৌরী আইয়ুব। উনার বাড়িতে ঢুকতেই পুরানো জমিদার বাড়ির মত ফটক ও ফটকের পাশেই দারোয়ান। তারপর তিন মহলা বাড়ি। নিয়ম কানুন মেনেই ফটক ও প্রতিটি মহল পার হয়ে বৈঠকখানায় বসলাম, ব্যারিস্টার গৌরী আইয়ুবের সঙ্গে শরণার্থী ও ত্রাণ সম্বন্ধে আলাপ করার পর চলে এলাম। ব্যারিস্টার গৌরী আইয়ুব বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত। কাজেই উনিও ত্রাণ দানের আশ্বাস দিলেন এবং তারিখ দিয়ে দিলেন।

২০শ পর্ব

এবার আমাকেও ত্রাণের লাইনে এসে দাঁড়াতে হলো। ঢাকা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র চৌধুরীর অধীনে কিছু কম্বল বিলানো হবে, এখানে কাকা সেলিনা বানুকেও শরণার্থী করে লাইনে দাঁড় করালেন। নভেম্বর মাস শীত পড়েছে, কম্বল তো লাগবেই। আমরা ওখান থেকে এসে সল্ট লেক ক্যাম্পে গিয়ে দেখি ওখানকার মেয়েদের অবস্থা খুবই করুণ, আমরা ওখানকার অবস্থা দেখে কেঁদেই ফেললাম। এর মধ্যে সেলিনা বানু বললেন, কেঁদে কাজ নেই, নারায়ণদা আমাদের এম.পি.-এর বাসায় যেতে বলেছে, সেখানে নাকি অনেক পুরোনো কাপড় জমা হয়েছে। চল আপাতত পুরোনোতেই চলবে। আমরা যেয়ে দেখি বৃহদাকারের পুরানো কাপড়ের স্তূপ যা আমাদের দেশের মেয়েরা বেড়াতে যেতেও ব্যবহার করে না। এত দামী দেখে মনে হচ্ছিল, ইন্ডিয়ার মেয়েরা বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুর্ভোগের কথা শুনে এতই ব্যথিত যে তারা পরনের কাপড়খানাও ওদের জন্য খুলে দিয়েছে। এত কাপড় ওখানে জমা হয়েছে দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত ইন্ডিয়ার মেয়েদের ভালোবাসার দান বিনা বিতর্কে গ্রহণ করা হয়েছে। এত দামী এত কারুকাজ করা শাড়ি ব্লাউজ, পেটিকোট ছিল প্রচুর। আগেই ওরা ভাগ করে রেখেছিল। আমাদের ভাগটুকু আমরা নিয়ে এলাম। যখন পুরোনো কাপড়গুলো সল্ট লেক ক্যাম্পে লিস্টে করা মহিলাদের দেওয়া হলো, তখন তাদের আনন্দ দেখে কে? অথচ ওরা সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে অভাব কোনদিন দেখেনি। এর আগে একদিন আব্দুল মতিন চৌধুরী পার্ক সার্কাসে তার ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শন করলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর। কলকাতায় এ কার্টুন ছবি যে দেখেছে তারা সবাই খুব প্রশংসা করেছেন এবং আর একদিন আয়োজন করা হলো অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীর ভাষণ। সেলিনা বানু বাড়ি এসে বলল, কিরে তোরা যাবি না? আমি বললাম, যাবো না মানে? আমাদের আপা, অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী ভাষণ দিবে, দেশের কথা বলবে, দেশের লোকের কথা বলবে অবশ্যই যাবো। আমরা দলবলে সবাই ভাষণ শুনতে পার্ক সার্কাসে গেলাম। এখন তো আমার থাকার জায়গার অভাব নেই, সেলিনা বানুর বাসা, জামাইবাবুর বাসা, বড়দার বাসা একখানে গেলেই হয় কাছাকাছি জামাইবাবুর বাসায়ই উঠলাম, ওখানে পৌঁছে দেখি মেসের ছেলেগুলো একত্র হয়ে মতিয়া চৌধুরীর বক্তৃতার সমালোচনায় মুখর। আমাকে দেখে আমাকেও নেত্রী বানিয়ে ফেলল। ওদের মুখ্য কথা হলো, বাঙালি মুসলিম মেয়ে কমনিস্ট এত সুন্দর করে পয়েন্টগুলো উত্থাপন করেছে সত্যিই অভাবনীয়। পশ্চিম বাংলায় কেন সারা ভারতেও এমন পয়েন্ট আউট করে কোন মেয়েই বক্তৃতা দিতে পারে না। সত্যিই আপার সেদিনকার বক্তৃতা ছিল খুবই প্রশংসনীয়। অবশ্য পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছিলেন, ‘আমি মতিয়া চৌধুরীর বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হই এবং ঐ রকম বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করি।’ বড়দার বাসায় থাকতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কারণ আমরা এসেছি শুনে আত্মীয়-স্বজনরা ওখানেই উঠত। সবার সঙ্গে দেখা হতো। আলাপ হতো। খুব ভাল লাগতো। এর মধ্যে শুনতে পেলাম, টাঙ্গাইলের ফৌজদারীর ক্লার্ক শ্রী ফনিন্দ নাথ বসুকে দুই রাজাকার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে সেনাবাহিনী তলব করেছে বলে সেও তার ভগ্নীপতি মিহিরের বাবাকে ধরে নিয়ে পার্কের পিছনে লৌহজং নদীতে মেরে ফেলে দেয়। মৃত ব্যক্তিদের স্ত্রীদের কাছে ছেলে দেশে ফিরে এসে শুনেছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় অনুমান রাত ৮ টায় ২ ব্যক্তি রাজাকার পিতা ও পুত্র ফনী বসুর বাড়িতে ঢুকে বলে, আপনাকে মিলিটারি তলব করেছে। কেন কি জন্য জিজ্ঞাস করা হলে বলেছে আমরা জানিনা। এক্ষুণি আসুন, শান্তশিষ্ট গোবেচারা মানুষ সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করে নিয়েছে। তাছাড়া সে তো কোন অন্যায় করেনি উনার স্ত্রীরা কান্নাকাটি করেছে, হাতে পায় ধরেছে কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হয়নি, নিয়ে চলে গেল, দুটো মেয়ে মানুষ কি করে রাতের বেলায় খুঁজবে? ওরা রাজাকার প্রধানের বাড়ি গিয়েছে। ওখানেও হাতে পায় ধরেছে। শেষ পর্যন্ত না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় খুঁজতে লাগল। একজন সাধারণ লোককে জিজ্ঞেস করল, আপনারা দেখেছেন কি দু'টো বয়স্ক লোককে? লোকটি বলল, আপনারা আরও একটু এগিয়ে দেখুন তো, নদীতে দুটো লাশ ভাসছে ওটা আপনাদের কিনা? তৎক্ষণাৎ মহিলা দুজনই দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল সত্যিই ওদের স্বামী, দুইজনেই তাকিয়ে আছে। বুক ফেটে আর্তনাদ বের হতে চাইলেও কিছু করার ছিল না। দুজনেই তাড়াতাড়ি করে লাশ দুটিকে টেনে নদীতে যেখানে স্রোত আছে সেখানে নিয়ে স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে দু'চোখে মুখে কান্না চাপিয়ে রেখে পালাতে চেষ্টা করল, লোকে চেয়ে যেন ভাববে ওরাই অপরাধী। উনারা আমাদের আত্মীয় ও ঘর লাগালাগি প্রতিবেশী। তাই তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতা ছিল অপরিসীম। লোক মুখে অন্যদের কাছে শুনেছি রাজাকার দু'টি ছিল পিতা ও পুত্র এবং কোন এক বিত্তশালীর প্রচেষ্টায় এমন কাজ হয়েছে। কলকাতায় এসে সস্তায় গাড়িতে ট্রামে করেই আমি সাধারণত যাতায়াত করি। একটি কারণ হলো আমরা ট্রাম কোনদিন দেখিনি, ট্রামে চড়িনি, তাই ট্রামের প্রতি আকর্ষণই একটু বেশি। মোমিনপুর ড্রাম ট্রাম করে হয়ে খিদিরপুর ও মোমিনপুর হয়ে বেহালার দিকে চলে যায়, ফার্স্ট ক্লাস ভাড়া ১০ নয়া পয়সা এবং সেকেন্ড ক্লাস ভাড়া ৫ নয়া পয়সা। ভাড়ার দিক দিয়ে ও চলাচলের দিক দিয়ে ট্রাম আমার কাছে খুবই পছন্দের যানবাহন। ফার্স্ট ক্লাসে উঠে আরামে বসে আছি, মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি হয়ে গেল। যাত্রীরা বসে দাঁড়িয়ে ভিড় করে চলেছে। তখনই আমি খুব জোরে চিৎকার দিয়ে উঠি। ওরে বাবারে মইলামরে, কে এমন দুক্ষুনদিলরে। তখনই এক মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আহারে বোনরে তুমি জয় বাংলার লোক তাই না? কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি। তুমি জয় বাংলার লোক। আঃ কি যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে। কত বছর পার হয়ে গেছে এ দেশে এসেছি তাই কি দেশের কথা ভুলে গেছি। তাই কি হয়? আমার বাড়ি বরিশাল ছিল। আপনার বাড়ি? আমি বললাম, টাঙ্গাইল শাড়ি তোমরা পর, সেই টাঙ্গাইল আমার বাড়ি বলতে বলতেই মোমেনপুর ট্রাম স্টপেজে এসে পড়ল, আমিও যথারীতি নেমে পড়লাম। হাত নেড়ে মহিলাকে বিদায় জানিয়ে আমি আমার গন্তব্যস্থানে চলে গেলাম। খানিকটা হেঁটে ও রেল লাইন পার হয়ে দাদার কোয়ার্টারে গিয়ে উঠলাম। সেদিন পহেলা ডিসেম্বর। বৌদিকে দেখে খুবই খুশি হলাম। এই প্রথম বৌদিকে দেখলাম। আমার ছোট ভাই বিমান বলেছিল, আমাদের বৌদি দেখতে মা দুর্গার মত। প্রথমদিন দেখেই আমারও তাই মনে হয়। বৌদি মুর্শিদাবাদের মেয়ে ১ম বিশ্ব যুদ্ধের আগে রাজশাহী ওদের বাড়ি ছিল এবং ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর ওর বাবাকে ডাক্তার হিসাবে মুর্শিদাবাদের জমিদার নিয়ে আসে। তারপর থেকেই ওরা মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা।

২১শ পর্ব

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমি যথারীতি কাজ করছি। এমন সময় যারা অনুষ্ঠান রেকর্ড করায় তারা আমাকে বলল, কাল থেকে আপনি আসবেন না। আমি বললাম কেন? ছেলেটি বলল, আসবেন না বললাম, আসবেন না। আমি বললাম, আমি আপনার কথা শুনবো না। জিজ্ঞেস করে দেখি মান্নান ভাই কি বলেন? মান্নান ভাই হলেন Incharge of all information (Brodcasting) Govt. Of Bangladesh. এখানে আমি যা বলব, তাই হবে বুঝতে পারছেন? আমি বললাম, আমার কিছু স্লোগান রেকর্ড করার আছে। যেগুলো গানের আগে পিছে চরমপত্র জল্লাদের দরবার বিশেষ কথিকা বঙ্গবন্ধুর বাণী ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে স্লোগান ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান জাগরণী ইত্যাদি প্রচার হতো।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকলে মনে হতো, আমরা যেন সত্যি সত্যি স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করছি। গান বাজনা, নাটক, নানারকম অনুষ্ঠান শুনে পরদেশে বাস করেও বাংলার অনুভূতিই বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। আমার মনে হলো মি. বি.সি. কর হল ইন্ডিয়া অফ ইঞ্জিনিয়ার ইনচার্জ। আমি খুঁজতে লাগলাম মি. কাউলকে। অন্যদিন চোখের কাছ দিয়েই ঘুরে। আর আজ খুঁজছি বলে তাকে পাওয়াই যাচ্ছে না। আগে যেন গায়ে পড়ে চোখের সামনে এসে কথা বলত, আলাপ করত আর আজ খুঁজছি বলে ওর পাত্তাই পাওয়া যায় না। যাক্ আমি ওর জন্য ধৈর্য ধরে বসে রইলাম। বসে থাকতে থাকতে ঘণ্টা দু'য়েক পর মহারাজের দর্শন পেলাম। আমি যখন মি. কাউলকে খুঁজছিলাম। তখন অন্য ছেলেরা বলল, আমরা বাঙালি, ছেলেরা থাকতে আপনার পশ্চিমা ছেলেই প্রয়োজন? বললাম, হ্যাঁ, বাঙালি ছেলে দিয়ে যখন প্রয়োজন মিটে না, তখন বাধ্য হয়েই হিন্দুস্তানির প্রয়োজন। সাবধানে কথা বলবেন। এই বলে আমি মি. কাউল এর কাছে গেলাম। মি. কাউল বলল, কি বলবেন, গোপনীয় কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। কাউল বলে তাইলে এখানে তো বলা যাবে না, চলুন বাইরে যাই। আমাকে নিয়ে উনি প্রেসের বাইরে যেতে যেতে একেবারে রাস্তায় গেল এবং বলল, এইবার বলুন আপনার বক্তব্য। আমি বললাম, আমাকে এখানে চাকরি দিয়েছেন মি. আব্দুল মান্নান এম.পি. আর উনারা প্রতিদিন বলে আপনার চাকরি আর নেই, কাল থেকে আর আসবেন না।

উনি বললেন, আমাকে কি করতে হবে? আমি বললাম, মি.বি.সি. কর ইন্ডিয়া অফ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ইনচার্জ। উনি বলেছেন যে, ওখানে যথেষ্ঠ হাত আছে মি. কাউল ইন্ডিয়ান ইন্টেলেকচুয়াল ব্রাঞ্চের লোক। এ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মি. কাউল হাত দিয়ে রাস্তার মধ্যে আমার মুখ চেপে ধরে বলল, যা বলার তা বলেছেন প্লিজ আর এ কথাটা একবারও উচ্চারণ করবেন না। আমি আমার দেশ ইন্ডিয়ার পথে কাজ করি। আপনি আমাকে কথা দিন এ কথা আর উচ্চারণ করবেন না। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করব। তবুও আমার কাজের কথাটা আপনি প্রকাশ করবেন না কথা দিন। উনি হাত পাতলো আর আমি উনার হাতে হাত রেখে বললাম, কথা দিলাম। মি. কাউল বলল, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, মি. কর আপনার নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তা না হলে এতবড় কথাটা উনি আপনাকে বলতেন না। আমরা দুজনেই এক সঙ্গে প্রমিসের ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমি ভিতরে গেলাম, যারা আমাকে প্রতিদিন বেতারকেন্দ্রে আসতে না করত তাদের কাছে গিয়ে উনি বলল, যতদিন পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আছে ততদিন পর্যন্ত শেফালী দাস থাকবে এবং তার চাকরিও থাকবে। ওরা এ কথা শুনে হা করে তাকিয়ে রইল, কিছুই বলতে পারল না। শুধু আমার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে রইল। আমি যেন আরও পূর্ণ সাহসে ও পূর্ণ উল্লাসে কাজ করতে লাগলাম। একদিন সেলিনা বানুর বাড়ি পার্ক সার্কাস থেকে বের হয়ে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে যাচ্ছি, পথে কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি এক মোল্লা বাড়ির লনে বেশ কয়েকজন মুসলমান বসে বসে গল্প করছে। আমাকে দেখে উনারা কেন যেন ডাকলেন বললেন, তুমি জয় বাংলার লোক? বললাম, হ্যাঁ কেন? আমাকে একটু ধমকের সুরেই বলল, কেন তা আবার জিজ্ঞাস করছ? একটা দেশকে ভেঙে দু টুকরো করে দিচ্ছ। আমিও তেজ গলায় জোর নিয়ে বললাম, ইতোপূর্বে যেন কোন দেশই ভাঙেনি। বিশেষ করে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে টুকরো হয়নি? লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমাকে মারবে। আমিতো একা যাচ্ছিলাম সঙ্গে কেউ ছিল না, ওরা তো ৪/৫ জন ছিল। মেরে গুম করে দেওয়া বিশেষ ব্যাপার ছিল না। আর একজন বলল, দেখ তেজ কত অন্যের দেশে এসে থাকছে-খাচ্ছে আবার কথা কত? আমার আরও রাগ বাড়ল আমিও জোরে জোরে বললাম আপনার কথায় আসিনি, যার কথায় এসেছি সে যখন চলে যেতে বলবে তখন অবশ্যই চলে যাব। এ কথা বলে আমি হনহন করে বেতার কেন্দ্রের দিকে হাঁটতে লাগলাম। এর মধ্যে আমরা বেশ বুঝতে পারছি। স্বাধীনতা অতিসত্বর ঘনিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে মা-বাবা মোমেনপুর দাদার কোয়ার্টারে এসে উঠেছে। আমিও এখন ওখানেই থাকি। বাবাকে বললাম, বাবা স্বাধীনতা তো অতিসত্বর। আপনারা না আসলেও পারতেন? মা বলল, একি করবি বল? রাজাকারদের অত্যাচারে আর টিকতে পারছিলাম না। পাড়ায় পাড়ায় রাজাকারের জন্ম হয়েছে, মিলিটারি তো আছেই।

সত্যিই এর মধ্যে অঘটন ঘটা আশ্চর্যের কিছু নয়। বললাম, বেশ করেছ, ভালই হয়েছে। এখানে প্রতিদিন স্বাধীনতার জন্য মিছিল সভা-সমিতি চলছেই। ডিসেম্বর যেদিন ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল, সেদিন কোলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল সারা কলকাতা সে আনন্দে যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। আমি বেতার কেন্দ্র থেকে হেঁটে ট্রাম স্টপেজে আসা অবধি বিভিন্ন দোকানদার নানা ধরনের পাবলিক আমাদের হাতে নানা রকম ফল, মিষ্টি ও ফুল উপহার দিচ্ছিল। আমার ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেছে। চাদরের কোচরেও আর আঁটে না। তখন আমিও অন্যান্য পথচারীকে মিষ্টি ফল দান করি, ওরাও খুশি। প্রথমে আমি বুঝিনি, ওরা যখন বলাবলি করছিল, অন্তত একটা দেশ তো আছে। যে দেশের লোকেরা বাংলায়

কথা বলে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সবই বাংলায় হয়ে থাকে। তখন আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার হতে থাকে। ৬ তারিখে ভুটান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে ভারতও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ এবং সমগ্র ভারতের প্রায় লোকই চেয়েছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। তাই তাদের সবার প্রচেষ্টা সার্থক হতে চলেছে।

রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের হচ্ছে। কোন এক কাজে গড়িয়া হাট গিয়ে আটকে পড়ি। বাংলার দেশাত্মবোধক গান গেয়ে গেয়ে ছেলে-মেয়েরা মিছিল করছে। শুনতে খুব ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল যে আমরা বাংলাদেশেই আছি। এদিকে স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিবাহিনীর জয়গান শুনতে পাই এবং মুক্তিযোদ্ধারা আপ্রাণ লড়াই করে বাংলাকে পশ্চিমা মুক্ত করছে, আমরা তার সংবাদ পাচ্ছি। ১৯৪৭ সাল থেকে আমরা দ্বিজাতিতত্ত্ব থেকে মুক্তি পেতে চলেছি। ৭ কোটি বাঙালির প্রাণের জাতীয়তাবাদ তত্ত্বই বাঙালিত্ব। সব বাঙালিই তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের দিকে। শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল আস্তে আস্তে স্বাধীন হচ্ছে। এ অবস্থায় সাধারণ বাঙালিদের অবশ্যই সাবধান হতে হবে। কারণ পাক-বাহিনী নির্লজ্জ হিংস্রজাত। হেরে গিয়েও পলায়ন পূর্বক বিষদাঁত ঢুকাতে ওরা কসুর করে না। টাঙ্গাইল প্রায় স্বাধীন হয়ে আসছে। তখন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল মামুন যার বাড়ি জামালপুর, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আসছিল। আরও একটু অপেক্ষা করে রওনা হওয়া উচিত ছিল তা না করেই স্বাধীনতার আনন্দে গাড়ি নিয়ে হুট করে ঢাকার দিকে রওনা হল। পলায়নরত পাকবাহিনী একটা গাড়ির শব্দ শুনে ওরা মির্জাপুরের গাড়িটি টার্গেট করে। গাড়ির চালক মির্জাপুরের ক্যাডেট কলেজের প্রফেসর। উনি গাড়ি থামিয়ে নামতে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় পাক বাহিনীর সেনারা ওকে গুলি করে, গুলি খেয়ে প্রফেসর পড়ে যায়, সঙ্গের ছেলেটি বাবাকে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে। পাক-বাহিনীর একজন বলল, চল তাড়াতাড়ি ওরা বাচ্চা মানুষ ওকে ছেড়ে দাও। পাকবাহিনীর লোকেরা ওদের ওখানে রেখে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। ছেলেটা গাড়িতে উঠে বাবাকে বলল, বাবা তোমার পা জোড়া লাগিয়ে দেই তুমি গাড়ি চালিয়ে ঢাকায় রওনা হও। প্রফেসর সাহেব বলল, তুমি পাখানা আমার পায়ে লাগিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে দাও। এইভাবে বাঁধা অবস্থায় ওরা ঢাকায় গিয়ে একখানা হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হলো। পরবর্তীকালে শুনেছি, বিদেশে পাঠিয়ে প্রফেসারের পা সরকার থেকে ভাল করে আসে। বর্তমানে উনি একটু খুড়িয়ে হাঁটলেও হাঁটতে কোন অসুবিধা হয়নি। পাটাও খুব ছোট হয়েছে, তাতেও কোন মুশকিল নেই।

আমরা কলকাতা থেকে বিপুল উত্তেজনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা শুনছি। ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার স্বীকৃতি দেওয়ার পর বিভিন্ন দেশও আস্তে আস্তে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে লাগল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, যুগবাণী আকাশ বানীর খবরগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে অনুধাবন করি।

আস্তে আস্তে বাংলাদেশ সম্বন্ধেও গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে। বাংলার দেশাত্মবোধক গান যেমন ধনধান্যে পুষ্পে ভরা; জয় বাংলা, বাংলার জয়, বাংলার মাটি বাংলার জল-এর সঙ্গে সঙ্গে আসছে শ্লোগান বাংলার মাটি দুর্জয় খাঁটি, তোমার আমার ঠিকানা ইত্যাদি। বিভিন্ন সংবাদের পর প্রচার করা হচ্ছে নানা শ্লোগান। যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে প্রতিদিন বেতার কেন্দ্রে যেতাম সেই রাস্তার দোকানদার ও পরিচিত পথচারীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। বাংলার স্বাধীনতা দেখে ওরাও আনন্দিত। আমাকে ডেকে বলল, দিদি খুশিতো? বললাম, খুশি হবো না, আজন্ম যে আকাঙ্ক্ষা করে এসেছি, সেটা আপনাদের আশীর্বাদে পূর্ণ হতে চলেছে, খুশিতো অবশ্যই। আপনারা না থাকলে ভারতের সাহায্য সহানুভূতি না পেলে কি এত বড় কাজ এত সহজে পরিপূর্ণতা লাভ করত। আপনাদের অবদান অপরিসীম ও আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা না পেলে এই পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব ছিল না। তাই আমরা আপনাদের কাছে চির ঋণী।

২২শ পর্ব

আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যথারীতি প্রোগ্রাম করে যাচ্ছি। এর মধ্যে একদিন মান্নান ভাই বেতার কেন্দ্রে এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? এখন তো আর তোমাকে কেউ বিরক্ত করে না। বললাম, না কেউ বিরক্ত করে না, ভালই আছি। বেশ কিছুদিন হয় সেলিনা বানুর বাসায় যাওয়া হচ্ছে না। মেয়ে দুটি আমার জন্য নাকি কান্নাকাটি করে, কথাটি শুনে আমি উনার বাসায় গেলাম। মেয়ে দুটি কি আর আমাকে ছাড়ে। আপা তুমি কিন্তু যাবে না। ওর মা বলল, যাবে না, তোমরা এখন ঘুমোতে যাও। ওরা কিছুতেই ঘুমোতে যাবে না। আমি বললাম, না গেল, আমরা এখানেই ঘুমোবো বলে ওদের নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম, আস্তে আস্তে ওরা ঠিকই ঘুমিয়ে পড়ল এবং আমি ওদের রেখে সেলিনা বানুর সঙ্গে বাইরে গেলাম। উনি মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যেতেন। আজকের প্রোগ্রাম ছিল কালী ঘাটের মা কালী দর্শন ও কিছু জিনিসপত্র কেনা। উনি বললেন, তুইতো পান খাস। এক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, সরতা আছে? দোকানদার বলল, না নেই।

ভিতর থেকে একলোক এসে বললো, আছে, দাঁড়ান বের করে দিচ্ছি বলে সরতা বের করে বলল, এই নিন। ওটা দেখে আগের লোকটি বলল, ও যাতি। কত দাম? বলল, এক টাকা পঁচিশ পয়সা। আমরা বললাম, ছাকনি আছে? ছেলেটি আবার বলল, নেই। সেই লোকটি ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বলল, আছে এই নিন। ছেলেটা এবার বলল, ও চালনি, আটা চালনি। লোকটা বলল, আপনারা জয় বাংলার লোক তাই আমি বুঝতে পেরেছি। আমার বাড়ি কুষ্টিয়াতে ছিল তাই আমি ভাষা বুঝতে পারি।

দিনগুলো ভালই কাটছিল। মেজদি মায়ের মত ভালোবেসে বোলপুর থেকে মোয়ামুড়ি, মুরগীর ডিম, পিঠা করে পাঠিয়ে দিত। আর একজন বেশি করে সঙ্গ দিত, তার নাম প্রেমানন্দ গায়েন। আদিত্যপুর গেলে যৎযাবতীয় কাজ প্রেমা করে দিত এবং মেজদির ফুট ফরমায়েস খাটত, তখন সে এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। নিতান্তই বালক, কিন্তু স্বভাব ও ব্যবহার খুবই ভালো। আমরা যখন বোলপুর যেতাম, তখন প্রেমা সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। কখন কীসের দরকার হয় তার তদারকি করত। আমি তো সপ্তাহে একদিন মঙ্গলবার ছুটি পেতাম। সোমবার বিকেলে বোলপুর যেতাম আর মঙ্গলবার বিকেলে রওনা হতাম। শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকার ট্রেন ভাড়া মওকুফ করে দিয়েছে। একদিন হাওড়া স্টেশনে আমাকে ধরে বলল, টিকিট। আমি বললাম, শরণার্থী। টি.টি. বলল, দেখে তো মনে হয় না। আমি বললাম, শরণার্থীদের চেহারা আলাদা থাকবে নাকি? যা দেখে মনে হতে পারে শরণার্থী? টি.টি. রেগে বলে উঠলো টিকিট নেই আবার বেশি বেশি কথা বলছে যাও যাও, আমিও তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্য থেকে বের হয়ে রাস্তার দিকে চলে এলাম। বেশ কয়েকদিন হয় সেলিনা বানুর বাসায় যাওয়া হয়নি। তারপর একদিন উনার বাসায় ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে বললেন কিরে শেফালী আমাদের ভুলে গেলি। আমি বললাম, কি যে বলেন ফুফু আপনাকে কি ভোলা যায়? আপনাকে ভুললে তো নিজের অস্তিত্বকেই ভুলে যেতে হয়। হেসে দিয়ে সেলিনা বানু বললো, বেশ কথা শিখেছিস তো? বললাম, শিখবো না, কার ভাইঝি। সবাই হো হো করে হেসে উঠল। সত্যিই ও বাড়িতে না গিয়ে আমি থাকতেও পারি না। তার কারণ সেলিনা বানুর অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা। সেলিনা বানু বিভিন্ন সংস্থার সাথে জড়িত এবং বিভিন্ন কাজে একদম সময় পায় না।

বর্তমানে আমি নির্বিঘ্নে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাচ্ছি এবং কাজও ভালভাবেই করতে পারছি। এর মধ্যে মি. কাউলও মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। এর মধ্যে একদিন দেখলাম গায়ক অরুপ রতনকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। উনার সঙ্গে আলাপ হলো, তারপর উনি চলে গেলেন। আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে বেতার কেন্দ্রের সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে লাগল।

একদিন দেখলাম প্রধানমন্ত্রী এসেছে, তারপরের দিনই বেতার কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রচার করা হল। এই রকমভাবে নেতাদের ভাষণ প্রচার মাঝে মাঝেই করা হতো এবং এখান থেকেই তা রেকর্ড করা হতো। এই রকমভাবে আমরা নেতাদের সঙ্গেও পরিচিত হতে লাগলাম। কলকাতা এসেছি, গঙ্গায় স্নান করব না তাই কি হয়। কলিযুগে গঙ্গা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। একদিন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে গঙ্গাস্নান করতে বের হলাম। কেউ বলল, কালীঘাটে যাবো, আবার কেউ বলল, দক্ষিণেশ্বর যাবো। ভাবলাম গাড়ি নিয়েই যখন যাবো, বাবা-মাকে বাদ দিবো কেন? উনাদের সঙ্গে আমাদের গাইডার প্রেমাকেও নিলাম। ভোরবেলা রওনা হলাম। সবাই বলল, আগে দক্ষিণেশ্বরে স্নান করে তারপর কালীঘাটে যাবো। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই যখন নদীর ঘাটে দাঁড়ালাম তখনই যেন সুন্দর নির্মল বাতাসে অনাবিল আনন্দে শরীর ভরে গেল, কি সুন্দর স্রোত, স্বচ্ছ জল, আস্তে আস্তে নদীর দিকে সত্যি আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। গঙ্গার জলে হাত দিয়েই ওর শীতলতা অনুভব করলাম। দক্ষিণেশ্বরে মা কালী প্রতিষ্ঠা করেছে রানী রাস মনি। তার কর্তৃত্বে প্রথম দিকে এই মন্দির পরিচালিত হ'তো। বর্তমানে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। তাই ঐ মন্দির সর্বসাধারণ দ্বারা তাদের মত করে পরিচালিত করেছে। মন্দিরের নিয়ম কানুন সারতে, ভোগ গ্রহণ করতে করতে বেলা দুপুর হয়ে গেল। সবাইকে বললাম, এখন কি তোমরা কালীঘাট যাবে নাকি বাড়ি ফিরে যাবে? কারণ কালী ঘাট পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা লাগবে। ওরা বলল, মায়ের নাম নিয়ে যখন বাড়ি থেকে বের হয়েছি অবশ্যই মাতৃদর্শন করেই যাবো। কালী ঘাটের কাল একান্নপীঠের এক পীঠে। তাই এটার গুরুত্বও কম নয়, সন্ধ্যায় গিয়েছি মাতৃদর্শনে তাও দেখি প্রচণ্ড ভিড়। আমরা একটা পাণ্ডা ধরলাম, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবো এবং পাণ্ডা আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিল। সন্ধ্যা ৮ টার দিকে পূজা সমাপ্ত করে ও মাতৃদর্শন করে ওখান থেকে চলে এলাম, সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম তারা মাতৃদর্শন করতে পেরেছে কিনা। সবাই বলল পেরেছে। শুধু কমলদি বলল, নারে, আমাকে আর একদিন আসতে হবে, তাতেই বুঝতে পারলাম কমলদি সঠিক মাতৃদর্শন করতে পারেনি। আমারও মনটা যেন কেমন খচখচ করছে, আমিও স্পষ্টভাবে মাকে দর্শন করতে পারিনি।

থাক কলকাতাতেই যখন আছি একদিন এসে দেখে নিব। সেলিনা বানু তো আমাকে মাঝেমাঝেই কালী ঘাটে নিয়ে আসে, একদিন ভিতরে ঢুকে দেখে নিব। সত্যি সত্যিই একদিন পাণ্ডা ছাড়া ভিতরে ঢুকে মায়ের দর্শন চাইলাম, হাত জোড় করে চোখ বুজে মায়ের মুখখানা স্মরণ করতে করতে মা যেন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। আমাকে আগের বারের মত উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে হল না। স্পষ্ট মায়ের মূর্তি দেখে কেঁদে দিয়ে সরে এলাম, এই তো মা! এই তো মা! বলতে বলতে বাইরে এলাম।
আমার পিছনে এক পাণ্ডা দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, দর্শন পেয়েছ মা? আমি বললাম, হ্যাঁ ঠাকুর মা আমাকে কৃপা করেছে। তখন পাণ্ডা হাত পেতে বলল, বেশ ভাল, আমার প্রণামী দাও। আমি এত খুশি হয়েছি যে ঠাকুর চাওয়ার আগেই ওর আশাতিরিক্ত প্রণামী আমি দিয়ে দিলাম। প্রণামী পেয়ে খুশি হয়ে পাণ্ডার মাথায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ায়ে আমার হাতে দিল আর এক থালা প্রসাদ আমাকে দিয়ে বলল, বাড়িতে নিয়ে সবাইকে খাইয়ে দিবে। একাত্তর সালের ৭ ডিসেম্বর আমার মাতৃদর্শন লাভ হলো। প্রফুল্ল মন নিয়ে যখন সেলিনা বানুর কাছে ফিরে আসি তখন উনি জিজ্ঞেস করলেন, কিরে এত খুশি কেন পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলো? আমি বললাম, হ্যাঁ যার কাছে মন খুলে সব বলা যায়, যিনি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেন। আমি আরও উৎসাহিত হয়ে বললাম, ফুফু এবার আর কেউ ফেরাতে পারবে না। আমার বাংলা মা এবার স্বাধীন হবেই আমি নিশ্চিত। ফুফু আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, এত কনফিডেন্স? মা তোকে বলেছে কিছু? আমি বললাম, তাই কি হয়, আমি কি এতই পুণ্যবতী যে মা আমার সঙ্গে কথা বলবে? আমি এখানে এসে বুঝে নিয়েছি বাংলার স্বাধীনতা কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না বলে সেলিনা বানুর বুকে পড়ে কেঁদেই ফেললাম। উনি বললেন তাই যেন হয়।
দাদার কোয়ার্টারের পাশের কোয়ার্টারে এক বাঙালি ভদ্রলোক বদলী হয়ে এসেছে। উনার বৃদ্ধ বাবা আমাকে ডেকে বললেন, তুমি তো জয় বাংলার লোক, মি. দাসের বোন হও। তোমাদের পূর্ববাংলায় বাঙালি কতজন? বললাম, কেন আমরা সবাই তো বাঙালি ৭ কোটি বাঙালি শুনে ভদ্রলোক বলল, মুসলমানরাও বাঙালি? আমি বললাম, যারাই বাংলা ভাষী বাংলায় কথা বলে তারাই বাঙালি। ভদ্রলোক বললো, ওখানকার হিন্দু মুসলমান সবাই বাংলায় কথা বলে? বললাম, হ্যাঁ। ভদ্রলোক বললেন, তাহলে যুদ্ধটা কাদের সঙ্গে? আমি বুঝতে পারলাম। ভদ্রলোক ভুল বুঝেছে কারণ যুদ্ধটা হচ্ছে অবাঙালি শোষকদের সঙ্গে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শাসকদের শোষণ বাঙালিদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইত্যাদি ভদ্রলোককে বুঝালাম। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকটি বলল, ও আমি ভেবেছি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই, এখন বুঝতে পেরেছি, দুনিয়ার বাঙালি এক হও। তাইতো দেখি এদেশের অবাঙালি অনেক মুসলমানই তোমাদের উপর ক্ষেপে আছে। শুধু ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের জন্য কিছু করতে পারছে না। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার যেমন নিজেদের দেশকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রেখেছে, তেমনি সমস্ত শরণার্থীকে তারা পূর্ণ নিরাপত্তায় আবৃত রেখেছে।

২৩শ পর্ব

স্বাধীনতার কয়দিন পরে আমার বড়দার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তার নামকরণে আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কি নাম রাখা যায়, আর সে নামটা যেন আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে মিল রেখে হয়। কাকাকে বললাম, কাকা আপনার নাতনীর নাম আপনি রাখুন, কাকা হেসে বলল, ভাবতে দাও। ভাবতে দিব না মানে আপনি সারা দিনরাত ভাবুন। সেদিনও নামের কোন সুরাহা হলো না। অনেকেই অনেক নাম বলল, কিন্তু কারও কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না। ২/৩ দিন পর কাকা বলল, দেখতো তোমরা এ নামটা-তোমাদের পছন্দ হয় কিনা? বাংলাদেশ স্বাধীনের মাসে এবং ‘৭১ এ ওর জন্ম তাই ওর নাম হোক “জয়তি”। আমরা সবাই নামটা লুফে নিলাম, মানে সবারই পছন্দ হয়েছে, যাক শেষ পর্যন্ত জয়তি নামটাই আজও টিকে আছে। ঐ মেয়েটি এক স্কলার পুত্রের জননী এবং নিজেও এম.এ. পাশ বর্তমানে বোলপুর মাদার তেরেসা নামক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।
তাছাড়াও ওরা মা ও ছেলে দুজনেই সঙ্গীতে পারদর্শী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মেয়েটি কয়েকবার এখানে এসেছে, ওর খুব ভাল লেগেছে। আমরা ওর নামটা ছোট করে ডাক নাম রেখেছি জয়ী। আমার বড়দা মেয়ের জামাটা বাংলাদেশের পতাকা লাল সবুজের ডিজাইন করে ভিতরে সুইসুতা দিয়ে জয় বাংলা এম্ব্রয়ডারি করে দিয়েছে এবং চতুর্দিকে শাপলা ফুল এমব্রয়ডারি করে সুন্দর করে তুলেছে, ভারী ভাল লাগছে। বড়দা খুবই কাজের এবং তার হাতের কাজও চমৎকার। মাটির কাজ, সূচ সুতার কাজ, ইলেক্ট্রনিক কাজ সাংসারিক কাজ নানা ধরনের কাজে পটু। ফুল, সবজির বাগান বাইরে ও ছাদে যত্ন সহকারে করেছে। বড়দা কামান বিহারী দাস খুবই স্নেহপ্রবণ। বোনদের যেমন ভালোবাসে তেমনি তার তিন কন্যাকেও বুকে আগলে রাখে। ৭১ এ যতদিন দাদার কোয়ার্টারে ছিলাম, বাবা আমার তার আত্মীয় স্বজনে ভর্তি থাকত। কোনদিনও বড়দাকে কখনও মুখ বেজার করতে দেখিনি। বাবাকে বলতাম, এত আত্মীয় স্বজন আনবেন না বড়দার জুলুম হয়। কে শুনে কার কথা উনি তো পূর্ববঙ্গের লোক, আজন্ম আত্মীয় বৎসল। যাক যেমন থাকতে ভালোবাসেন তেমনই থাকবেন। বৃদ্ধ বয়সে মনে ব্যথা না দেওয়াটাই ভালো। বৌদিটাও ঐ রকম হাজার অসুবিধা হলেও মুখ ফুটে কিছু বলবে না। ওরা দুজনেই সেদিকে খুব পছন্দ করে। আমি আগেই বলেছি, মেজদি মায়ের মত আদর যত্ন করে এবং মায়ের কর্তব্য পালন করে। তাই মেজদি সবার প্রিয়। মাঝে মাঝেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেলিনা বানুর বাসায় যাই। সেদিন যেয়ে দেখি উনার মেয়ে মিথিলা এসেছে। মিথিলা আমার কাছে এসে বলল, আপা অনেকদিন পর তোমার সাথে দেখা হলো। আমি বললাম, তাতো হলোই। কারণ আমার বোন তো খুবই ব্যস্ত, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, তার দেখা পাওয়া কি এতই সোজা, এসো আমার কাছে এসো, একটু ছুঁয়ে দেখি একটা আস্বাদন নেই মুক্তিযোদ্ধার

কদরটা। সত্যি সত্যিই মিথিলা কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, আমিও আদরের চোটে ওকে চুমু খেলাম।

তাই দেখে ওর ছোট বোন সূচীও দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে আমাকে খাবেন না। বললাম, এক যাত্রায় পৃথক বল কি করে হয় বলে ওকেও একটা চুমু খেলাম, তাই দেখে দিলুও দৌড়ে এল, বোনদের আদরই বেশি। তাই আমি বাদ পড়লাম। আমি ওকেও জড়িয়ে ধরে বললাম, না ভাই তোমার আদর সর্বাগ্রে বলে ওকেও একটা চুমু খেলাম। দূরে দাঁড়িয়ে সেলিনা বানু হাসতে হাসতে বলল, এই বন্ধন যেন চিরকাল থাকে। আমি বললাম, আশীর্বাদ করুন যেখানেই থাকি না কেন বন্ধন অটুট রাখতে চেষ্টা করব। এরপর সেলিনা বানুর ঢাকার বাসায় গিয়ে শুধু শাহজাহান ফুফার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আর উনার বান্ধবী বিদেশিদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। একদিন শুনলাম সূচী ডাক্তার হয়ে টাঙ্গাইলের বাসাইল বদলী হয়ে এসেছে। একদিন দেখা করতে গেলাম, ওর দেখা পেলাম না। সেলিনা বানুর কথাই ঠিক, বন্ধন টিকিয়ে রাখতে হয়। ইদানিং বৃদ্ধ বয়সে আমি একটি ছেলেকে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে স্নেহ দিয়ে ছোট ভাইয়ের মত ভালোবেসেছিলাম। কল্যাণকে যেমন স্নেহ করতাম ভালোবেসেছিলাম ঠিক তেমনি। ছেলেটার নাম গোপাল। সে আমাকে হারে হারে বুঝিয়ে দিল সে আমার কেউ নয়। কারণ আমি ওর আত্মীয় নই, ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, সামাজিক সম্পর্কও নেই, কাজেই কোন সম্পর্কও নেই। ওকে বলেছিলাম, কেন আত্মার টান? তার কি কোন মূল্য নেই? গোপাল বলেছিল, না। সেদিন খুব কেঁদেছিলাম আর সত্যিই এটা সত্য যে এ দুনিয়াতে কেউ কারো নয়। তারপর থেকে নিজেকে খুব অসহায় ও একাকী মনে করি। স্বাধীনতা আসন্ন প্রায়। আমরা দিন গুণছি কবে এই অমূল্য রত্নটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে আমরা তো ভারতে অবস্থান করছি, তাই যুদ্ধের বাস্তবতা ঠিক বুঝতে পারছি না। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন এলাকা মুক্ত হওয়ার খবর শুনছি। আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরই মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী জোরদার যুদ্ধ করে যাচ্ছে। প্রতিদিন সংবাদ শুনে মনে হচ্ছে, আজই বাংলা স্বাধীন হবে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় শেরপুর, জামালপুর প্রথমে মুক্ত হলো। ১০ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহের উপকণ্ঠে তারাকান্দি মুক্ত হলো আস্তে আস্তে বর্ডার এলাকাগুলো মুক্ত হতে লাগল। ১০ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ শহরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী ঢুকে পড়েছে।

ঐদিনই ভারতীয় ছত্রীবাহিনী টাঙ্গাইলের উপকণ্ঠে গ্রামাঞ্চলে অবতরণ করে। বানিয়াফৈর, ব্রাহ্মণকুশিয়া, ঘারিন্দা, ভুক্তা, চাম্মারিয়া বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করে। বড়দা দেখে দেখে যায় এবং ওরা ইশারা করে সরে যেতে। একটা প্যারাসুট আমাদের বাঁশঝাড়ে আটকা পড়ে যায়। সে যখন নামতে পারছিল না, তখন বড়দা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ছত্রীসেনাকে উদ্ধার করে। বড়দা একটা প্যারাসুট স্মৃতি হিসাবে এখনও যত্ন করে তুলে রেখেছে। আমরা খবর শুনে নিশ্চিত হয়েছি ২/১ দিনের মধ্যেই টাঙ্গাইল স্বাধীন হবে। আমাদের কোলকাতার বাসায় আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সে কি উল্লাস, মনে হচ্ছে পারলে এখনই টাঙ্গাইল চলে যাবে। আমি বললাম, দাঁড়াও অপেক্ষা কর, আগে মুক্ত হোক। ঢাকা তো হেডকোয়ার্টার। ঢাকাই তো আমাদের সব। সবাই বলতেন তাইতো সত্যি তো, অপেক্ষা করতেই হবে। এখন আমরা প্রতিদিন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাংলা খবর, যুববাণীর খবর, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনা চাই-ই। এক বেলাও বাদ দেওয়া যাবে না জল্লাদের দরবার। চরমপত্র এ সমস্ত আমাদের শুনতে হবেই। প্রতিদিন কোন না কোন এলাকা স্বাধীন হচ্ছে, আর আমাদের আনন্দ আর ধরে না। স্বাধীন বাংলা বেতার খোলার সঙ্গে সঙ্গে জয় বাংলা বাংলার জয় গিয়ে শুরু হলো সকালের অধিবেশন। বাংলা খবর শুরু হতেই টাঙ্গাইল স্বাধীন হওয়ার খবরটি শুনতে পেলাম এবং শুনে আমরা ঘরভর্তি মানুষ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। অনেকদিন হয় মা রান্না করে না আমরাই রান্না করি। আজ এই আনন্দের দিনে মা রান্না করবে এবং তাকে সাহায্য করবে কমলদি ও বৌদি। খাবার পরিবেশন করব আমি ও সোনালী। এর মধ্যে ফোনে বড়দা কাকাত ভাইদের নিমন্তন্ন করল খাওয়ার জন্য। বড়দার অফিসের দুজন অফিসারকে তাদের স্ত্রীসহ নিমন্তন্ন করা হলো।

দুজন অফিসার বাঙালি, তারাও খুব খুশি। মি. মুখার্জী আমাকে বলল, তাহলে তো আপানারা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন। আমি বললাম, না, তা কি করে হয়। আগে রাজধানী শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন হোক তারপর না যাওয়ার চিন্তা। তাছাড়া আমরা তো এখন কপর্দকহীন পাকজান্তারা তো শুধু মাটিটুকুই রেখে গেছে। আর সব তো ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই ফিরে যাওয়ার পরিস্থিতি আমাদের তৈরি করতে হবে। আমাদের এখন থেকেই বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিতে হবে। কাকা আসুক উনার সঙ্গে পরামর্শ করে যেটা হয় সেটা করা যাবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে মা-বাবাসহ আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেঝেতে বসে পুরানো দিনের কথা আলাপ করে খুব মজা পাচ্ছিলাম। ওরা বলল, দেশে ফিরে শেফু তুই কি করবি?

-কি আর করব, আমার করার কি আছে? আমার তো চাকরি আছেই ওখানেই যাবো। প্রতিদিনই আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যেতে হয় এবং আরও উত্তেজনাকর সংবাদ পর্যালোচনা পাঠ করতে হচ্ছে। ১১ ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মুক্ত হয়। ১০ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইলে ছত্রীবাহিনী নামার সঙ্গে সঙ্গে কাদেরীয়া বাহিনী এসে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। এমন অবস্থায় হানাদার বাহিনী পালিয়েও কূল পাচ্ছে না। মুক্তিবাহিনীর জয় বাংলা স্লোগান শুনে প্রতিটি বাড়ির দুয়ার খুলে গেল আর বাড়ি থেকে লোকজন জয়বাংলা স্লোগান দিতে দিতে দৌড়িয়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। সারা টাঙ্গাইল শহর আনন্দে উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে জয়বাংলা শ্লোগান দিয়ে সবাই আনন্দে যেন ফেটে পড়েছে। আমি নিতান্তই ভাগ্যহীনা এমন আনন্দমুখর সুন্দর একটা দৃশ্য চাক্ষুষ অবলোকন করার ভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু টাঙ্গাইলের বিজয় অশ্রু দিয়ে অবলোকন করতে পেরেছি। তখন কেবল ভাবছি কবে টাঙ্গাইল যাবো, কবে টাঙ্গাইলের স্বাধীন মাটিতে পা রেখে অনাবিল সুখ ও শান্তি আস্বাদন করব। এখনও আরও মনোযোগ দিয়ে বাড়ির সবাই স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর শুনে। আমাকেও প্রতিদিন সংবাদ পর্যালোচনা পড়তে হচ্ছে এবং নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের খবরা খবর এখানে এসে

পৌঁছছে। আমরা ঘরে বসে ঠান্ডা মাথায় ভাবছি, কেন ভারতীয়রা পাকিস্তান আক্রমণ করছে না, এই তো সময়। সময় বারবার আসে না। আর উল্টো দিকে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আছে, তাদের মাথা উত্তপ্ত, সর্বদা চিন্তা কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, একটু এদিক-ওদিক হলে, একটু ভুল হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ.সি. নিচে বসে যা চিন্তা করা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে তা করা সম্ভব নয়। জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে এগারটি সেক্টরে বিভক্ত করে দিয়ে এক এক সেক্টরে একজন করে কমান্ডারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সব কমান্ডারগণ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ বাহিনী গঠন করে। এই যৌথ বাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে।

আর যেসব মুক্তিযোদ্ধা দেশের প্রেমে প্রাণের টানে দেশকে বাঁচাতে যুদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে একজন স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা, সবার প্রিয় এবং সত্যিকারের নির্ভেজাল মুক্তিযোদ্ধা তিনি হলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। উনার সেক্টরে উনিই সর্বেসর্বা। বাড়িতে এসে দেখি সবাই স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ শুনছে। আমিও বসে গেলাম, এম.আর. আখতার মুকুলের চরমপত্র হচ্ছে। তাঁর বজ্রকণ্ঠে ঢাকার আকাশে পাক বাহিনীর সঙ্গে যৌথ বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। একদিকে আকাশে দুর্দান্ত ফাইট হচ্ছে। ভারতীয় বাহিনী কিছুতেই তাদের অবতরণ করতে দিবে না পাকবাহিনীও নাছোড়বান্দা খানিক পর পর হুলো বিড়ালের মতো আক্রমণ করছে। ভারতীয়রা যখন কঠোর যাঁতা দিল, তখন পাকিস্তানি বিমান কিছু ধ্বংস হলো আর বাকীগুলো পালিয়ে গেল। একদিকে আকাশ পথে বিমান আক্রমণ অন্য দিকে পদাতিক সৈন্যরা সমতলে ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগল। এখানেও পাকবাহিনী বিচ্ছুদের কাছে হেরে পিছু হাঁটতে লাগলো। স্বাধীন বাংলার খবরের পর জয় বাংলা গান দিয়ে বেতার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেল।

২৪শ পর্ব

৩ ডিসেম্বর থেকেই সবাই বুঝতে পেরেছিল বাংলাদেশের জয় অনিবার্য। বিভিন্ন সেক্টরে, বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তি বাহিনী ও যৌথ বাহিনীর জয় জয়কার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশা পাক বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করতে ও অস্ত্র ফেলে দিতে তার ভাষায় হাতিয়ার ডাল কো এটা ঘোষণা করা হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বর, কোন দিক থেকেই পাকবাহিনী এগুতে পারছে না। জলপথ, স্থলপথ ও আকাশপথ কোন পথই তাদের জন্য খোলা নেই। আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের আর উপায় নেই, জেনারেল নিয়াজী যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই তার সামনে বোমা ফেলা হয়েছে। এগুলো বুঝেও নিয়াজী চুপ। ১৪ই ডিসেম্বর তো আমরা বিজয়ের কাছাকাছি অবস্থান করছিলাম। চতুর্দিক থেকে নিয়াজী আটক পড়েছে আর আশা নেই ভেবে বাধ্য হয়েই তাকে আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিতে হবে। আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে দূতাবাসের সঙ্গে নিয়াজী আলাপ করে। একদিন নিয়াজী মার্কিন রাষ্ট্রকে অত্যাধিক ভরসা ও বিশ্বাস করেছিল। কারণ এই মার্কিন রাষ্ট্রই পাকিস্তানকে দিনের পর দিন বিপক্ষে নিয়ে যাচ্ছিল, আর ইন্ডিয়ার বিরোধিতা করে পাকিস্তানকে মিথ্যা আশা দিয়ে জিতিয়ে দিতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের অবস্থা যখন খুবই করুণ, আর কোন পথ নেই তখন পাকিস্তানের গভর্নর ডা. মালেক প্রেসিডেন্টের কাছে বার্তা পাঠালো আত্মসমর্পণের কথা জানিয়ে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানতো অন্য মেজাজে ছিল। হঠাৎ করে তার ঘুম ভেঙে গেল। একি কথা! তারপর সব শুনে সে অনুমতি দিল। অনুমতি পেয়ে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের সমস্ত নিয়ম কানুন ও প্রস্তুতি নিতে লাগল। ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দিন স্থির করা হলো ভোর পাঁচটা থেকে। সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে বিকেল ৫ টায় আত্মসমর্পণ করা হলো। ১৬ ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিকেল ৪টা নাগাদ আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হলো। দলিলে স্বাক্ষর করলেন। জেনারেল নিয়াজী তার কোমরের রিভলভার খুলে জেনারেল অরোরার হাতে সমর্পণ করল। ঐ দিনই আইনত ভাবে পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান নামক প্রদেশটি। নতুন দেশের অভ্যুদয় হলো, যার নাম বাংলাদেশ।

তারপরই শুরু হয় ঢাকায় উত্তাল জনতার উল্লাস। বিধ্বস্ত ঢাকা যেন নূতন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বাংলার প্রিয় গান দিয়ে শ্লোগান দিয়ে জনতা ও মুক্তিবাহিনী রাস্তায় নেমে আনন্দ উল্লাসে উন্মত্ত। এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা, এত বঞ্চনা, আজকের আনন্দ দেখে মনে হয় ওগুলো কিছুই নয়। লাখো শহিদের রক্ত, লাখো মা-বোনের মান সম্ভ্রম হারিয়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি আমাদের অতি প্রিয় সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। আজ যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমি আগের দিনের মত বাঙালি ভারতবাসী আবার দেখলাম মিষ্টি ও ফল বিতরণ করছে। আমাকে দেখে ওরা খুশি হয়ে আমার হাতে মিষ্টি ও ফল গুঁজে দিয়ে বলল, দিদি যাবো বাংলাদেশে, যে দেশের জন্য এত লড়াই এত ত্যাগ তিতিক্ষা সে দেশ না দেখলে হয়। তাছাড়া দেশটি যখন দূরে নয়, আমাদের ঘরের সঙ্গে লাগানো। ঠিকানা রাখবেন আপনারা গেলে আমরা আপনাদের সাদরে গ্রহণ করব।

২৫শ পর্ব

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে একটু রাত্রি হলো। বাড়ি পৌছে দেখি বাবা ও মা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উনাদের দেখে চমকে উঠলাম কোন দুর্ঘটনা ঘটেনিতো? বাবাকে বললাম, বাবা, আপনারা এখানে কেন? বাবা একটু হেসে বলল, আজকে তোর আসতে দেরী হবে তা জানি, কিন্তু এত দেরী হবে তা ভাবিনি, তাই তোকে এগিয়ে নিতে এলাম। ঘরে ঢুকে মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলল, আমার লক্ষী মা। এতবড় সংসার, সবার দায়িত্ব নিজ ঘাড়ে নিয়ে হাসি মুখে কি সুন্দর দিন কাটাচ্ছে। ওমা! তুমি কি বলছ, তোমরাই তো আমার ঘর করছ আমি কি করলাম? সত্যি করে বলতো, যতদিন আমরা এদেশে আসিনি ততদিন তুই তোর ভাইবোনদের ও আমাদের জন্য চিন্তা করিস নি? আমি হেসে বললাম, ও এই কথা-কোন দিদি তার ছোট ভাইবোনদের জন্য চিন্তা না করে। বাজে কথা রাখ। এখন বল আজ রাতের মেনু কি? মা বলল, আর ঘণ্টা খানেক দেরী করে রান্না বসাও। অনেকে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়তে পারে। মা কমলাদিকে বলল ওরা সবাই কষা মুরগীর মাংস পছন্দ করে। কাননের খোয়ারে মুরগী আছে ওখান থেকে নিয়ে নে। দেখ, কাননের বাগান থেকে আজ টসটসে বেগুন তুলেছি, এগুলো ভাজা হবে। সবাই বললাম, আর? মা বলল আর আবার কি? খিচুড়ি, কষা মুরগির মাংস, বেগুন ভাজা। সত্যি সত্যিই স্বাধীনতার সংবাদ শুনে দাদারা, বৌদিরা, ভাগে-ভাগ্নি, নাতী-নাতনী অনেকেই এলো। কেউ রাতে থাকলো আবার অনেকেই চলে গেল। কাকা আমার হাতে বেশ কয়েকটা টাকা দিয়েছে এবং বেতনও পেয়েছি। আমি মনে মনে ভেবেছি, এই টাকা দিয়ে বেড়াব তাছাড়া দেশ স্বাধীন হয়েছে কাজও নেই। এ কথাটা কাকাকে বলাতে ভীষণ রাগ করে উঠল। বলল, ও টাকা তোমাকে খরচ করতে দে এখনও জানিনা ই নি অর্থনৈতিক আমাদের অবস্থা কি? ওথেকে ব্যাংকে রাখবে। আমি যেন কেমন থ মেরে গেলাম।

তাছাড়া আমাদের তাড়াতাড়িই প্রস্তুতি নিতে হবে। দেশের কি অবস্থা কিছুই জানিনা। আমি বললাম, আমি জানি দেশে আমাদের কি অবস্থা, কাকা রেগে বলল, কি জান? আমি বললাম, আপনিও জানেন। আমরা নিঃস্ব কপর্দকহীন, বাড়িটুকু ছিল, তাও পুড়িয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে কাকা কিছুটা শান্ত হয়ে বলল ঠিক বলেছ, তাই আমাদের চতুর্দিক বিবেচনা করে চলতে হবে। অন্যের দারিদ্র্য দূর করতে নিজেই দরিদ্র হলাম। কথাটা শুনে আমার খুব দুঃখ লাগল, যার কাছে কোনদিনও নিজের স্বার্থের কথা শুনিনি, তার মুখে একি কথা। থাক কাকা আজ আর কথা নয়। লিস্টও নয় যা হবে পরে হবে। কারো বাড়িতে কোথাও যাওয়া যাবে না ভেবে মনটা খুবই খারাপ হলো। মনে মনে ভাবলাম প্রেমা ও কল্যাণকে নিয়ে নিকটতম আত্মীয়দের বাড়ি ঘুরে আসব। পরের দিন কাকা এসে বলল, শেফু তুমি কোথায় কোথায় যাবে তার একটা লিস্ট কর।

আমি বললাম কোথাও যাবো না ঠিক করেছি। কাকা হেসে দিয়ে বলল, ওমা দেখ মেয়ের রাগ। কি বলেছি, রাগ করার মত তো কিছু বলিনি। আমি বললাম, এখন আমার হাতে টাকা নেই। যখন টাকা হবে তখন যাবো। কাকা জোরে জোরে হেসে বলল, বেশ, তাই করো। মাকে ডেকে বলল, বৌদি শুনলেন মেয়ের কথা। বাবার ইচ্ছা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে যাবে কিন্তু সেটা অবিবেচকের মত হবে তাই কাকাকে বললাম, বাবাকে বুঝান। আমার স্কুল খুলে গেছে যত দেরী করব' তত টাকা কম পাবো, তাড়াতাড়ি কাজে যোগদান করা ভাল। বিমানের কলেজ খুলে গেছে ওরও তাড়াতাড়ি কলেজে যোগদান করা উচিত, এটা বাবা ও মা মেনে নিল। শুধু মেনে নিল না কল্যাণ। সে আমাদের সঙ্গেই বাংলাদেশে আসবে। বাবার ইচ্ছা আমরা কয়েকদিন থাকি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো আমরা ২১ শে ডিসেম্বর ১৯৭১ এ রওনা হবো। ১০ তারিখেই রওনা হতাম, কিন্তু বাবা বললেন, ১০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আসবেন, বড় পর্দায় সেটা দেখেই যা। আমাদেরও একটা আকাঙ্ক্ষা আছে প্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জ্যান্ত অবস্থায় দেখে নয়ন সার্থক করি। উনাকে দেখে কি যে আনন্দ হতো কি যে ভালো লাগতো। সেটা বলে শেষ করা যাবে না। তখনও ইন্ডিয়াতে টেলিভিশনের প্রচলন হয়নি। তাই বড় পর্দায় দেখানো হয় না। কল্পনায় দেখতে পেলাম আমাদের প্রেসিডেন্ট এলো পূর্বের মত দৃঢ় পদক্ষেপে সঙ্গে ভারতের প্রেসিডেন্ট। অনতিদূরে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। জওয়ানদের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিতে উঠলেন, জওয়ানদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তৃতা দিলেন।

২৬শ পর্ব

অবশেষে আমার অতি আদরের প্রিয় ভাই কল্যাণকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেই হলো। এমন নাছোড়বান্দা যে পিছন ছাড়লই না। কাঁধে ওর জামা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে ট্যাক্সিতে এসে বসল। আমরা মোমিনপুর থেকে ট্যাক্সি করে শিয়ালদহ স্টেশনে এলাম এবং সকালে চা খেয়ে রওনা হয়েছি। মা আর কমলদি বারবার বলে দিল, তোরা কিন্তু রাস্তায় কিছু খেয়ে নিস। না খেয়ে কিন্তু থাকবি না। আমি বললাম, অত চিন্তা করোনা যার সঙ্গে যাচ্ছি সে তোমাদের মতই। না খাইয়ে রাখবে না। শিয়ালদহ থেকে আমরা ট্রেনে চাপলাম এবং বনগাঁ এসে নামলাম। কাকা বনগাঁতে আমাদের খাইয়ে নিল। বনগাঁর পরেই বাংলাদেশ। তখন বাংলাদেশের পথঘাট খুবই খারাপ, রেল লাইনগুলো অচল। স্থলপথে বিভিন্ন ডাইভারশন কখনও হেঁটে কখনও রিক্সায় কখনও বাসে এইভাবে আমরা পৌঁছলাম। ওখানে আমাদের রাত্রি হলো। তাই এক হোটেলে উঠলাম কিন্তু সিট নেই। খাওয়ার পর রান্নাঘর পরিষ্কার করে ওখানে আমাদের ৪ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। কল্যাণ তখন স্কুলের ছাত্র। আমার শাড়ির আঁচল ধরে বলল, আমি আমার দিদির কাছে শুবো।

- যা তাই হবে। শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। রান্না ঘরের দুর্গন্ধে আমার সারারাত একটুও ঘুম হয়নি। কেমন যেন আঁশটে গন্ধ। ভোর বেলাতেই উঠে পড়ি। কাকারও তাই। এমনিতেই মাছ মাংস খান না, তার উপরে আঁশটে গন্ধ কি করে সহ্য হয়। কাকা আমাদের তাগাদা দিল হাত মুখ ধুয়ে এখান থেকেই নাস্তা খেয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দাও যাতে রাতের আগেই টাঙ্গাইল যেতে পারি। আমরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে হেঁটেই নদীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। প্রমত্ত নদী। জানুয়ারিতেও কি ঢেউ। খেয়া নৌকায় উঠে আমরা ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে নদী পার হয়ে ওপার গেলাম। আবার হাঁটতে হলো। কারণ কোনো রাস্তা নেই। বেশ খানিকটা হেঁটে তারপর আমরা বাসে গিয়ে উঠলাম। রাস্তায় দোকানে নানা নেমপ্লেট দেখে বুঝলাম, আমরা ঢাকার কাছাকাছি এসেছি। এ পথে কোনদিনও আসিনি। আবার বাস বদলানো, আবার হাঁটা এভাবে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

এখনকার মত তখন বোতলে করে খাওয়ার জলও পাওয়া যেতো না। অনেক কষ্ট করে কাকা এক দোকান থেকে জল জোগাড় করে দিল, তাই খেয়ে শান্ত হয়ে আবার চলতে লাগলাম। লেখা দেখলাম, কালিয়াকৈর থানা তখন যেন আত্মায় জল ফিরে এল। তারপর মির্জাপুর আসার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত আমার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। এইতো আমার জায়গা টাঙ্গাইল এসে পৌঁছেছি। মির্জাপুরের বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো যুবক টাইপের ছেলে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে বলল, কোত্থেকে এসেছেন। আমরা বললাম, ইন্ডিয়া থেকে। ওরা বলল, কোথায় যাবেন? বললাম, টাঙ্গাইল। ওরা আসুন আসুন বলে আমাদের একটা মাঠের দিকে নিয়ে গেল। মাঠটি ডেকোরেশনের কাপড় দিয়ে চতুর্দিক ঘিরে দিয়েছে এবং মাথার উপরে ছাউনি দিয়ে একটা হল তৈরি করেছে। ওখানে কয়েকটা চেয়ার ও টেবিল পাতা। আমাদের ডেকে ওখানে বসাল। তারপর থালায় করে গরম ভাত ও ডাল এনে দিল। ভরদুপুর ক্ষুধা পেয়েছিল খুব। তাই ইলিশ মাছ দিয়ে মাসের ডাল ভাত গোগ্রাসে গিললাম। ওরা বলল, সবাইকে মাছ দেওয়া সম্ভব নয় বলে ডালের মধ্যে মাছ ভেঙ্গে দিয়ে রেখেছি। সেই ৭১ সালের ইলিশ মাছের স্বাদই আলাদা। খাওয়ার পর টাঙ্গাইল যাওয়ার কোন যানবাহন পাওয়া যাচ্ছিল না। সার্ভিস বাস তো নেই অন্য কোন যানবাহন পাচ্ছি না। আমরা মির্জাপুর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় এক ইন্ডিয়ান আর্মির গাড়ি থামল, কাকা ওদের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের ডেকে বলল চল এই গাড়ি টাঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ডে যাবে এখন বিকেল হয়ে এসেছে। আধা ঘণ্টার মধ্যে আমরা টাঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ড এসে মাটিতে পা দিয়ে টাঙ্গাইল এসে পৌঁছলাম। এক অনাবিল সুখ অনুভব করলাম। এ মাটির স্বাদ যেন আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে দেহে অপার আনন্দ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সীমানায় যখন আসি তখন উনার পোড়া বাড়ি দেখে কান্না পেয়ে গেল। কাকাকে ডেকে দেখালাম, তারপর আমরা বাড়ি পৌঁছলাম। পৌঁছেই আগে আমাদের বাসা লোন অফিসে ঢুকে দেখি ঘরে রাজাকার গোছের লোক। এখনও আমার মিলিটারি ও রাজাকারের ভয় যায়নি। ওদের দেখে নূতন করে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলাম। লোকটা বলল, আমি আপনাকে চিনি আমি অটোচালক। কতদিন আপনাকে আমার অটোতে করে কলেজে নিয়ে গেছি। আমি রাগ করে বললাম, চেনো বলেই বাসা দখল করতে হবে। রাজাকার গোছের লোকটা বলল, না না আমরা কালই চলে যাবো। কাউকে কিছু বলবেন না। এ কথা বলেই লোন অফিসের চাবি আমার হাতে দিয়ে বলল, ওখানে থাকুন। আমি আমাদের বাসা থেকে বের হয়ে এলাম। এসে কাকাকে বললাম সব কথা। কাকা বলল, থাক কিছু বলে কাজ নেই। দেখা যাক, কি করে? এই কথা বলে কাকা বাইরে চলে গেল। তখন পাশের বাড়ির কাকিমা রাধুর মা এসে বলল, এ বেলা তোরা রান্নার ব্যবস্থা করবি না। আমার ওখানে তোরা খাবি। মনে মনে ভাবলাম, ভালই হলো। কিছুক্ষণ পর কাকা এসে বলল, কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো। আমরা বললাম, কাকা, হীরেন বাবুর বাসা থেকে আমাদের খাইয়ে দিয়েছে। এখন আপনি খেয়ে আসুন। কাকা বলল, আমি খেয়েছি। আমি বললাম, এটা হতেই পারে না। খেয়ে আসুন। কাকা বলল, আজকে আমি এখানে থাকবো। আজ প্রথম দিন আমরা একা কার মনে কি আছে কে বলবে? আমিও মনে মনে ভাবলাম আজ ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ এখনও যখন বাড়িতে রাজাকার রয়েই গেছে, কাজেই সন্দেহ করা অস্বাভাবিক নয়।

২৭শ পর্ব

আমি ঠিক করলাম ২৫ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বড়দিনের ছুটি কল্যাণ ও বিমানের সঙ্গে কাটিয়ে ২৬ শে ডিসেম্বর জামালপুরে কাজে যোগদান করব। দুপুরে আমরা কোন রকমে রান্না করে কলাপাতায় ঢেলে খেয়েছি। লোন অফিসে বসে আছি তখন এ্যাডভোকেট রশীদ খান এসে বলল, তোরা এসেছিস তা এখানে কেন? বাড়ির আর সবাই? বললাম, আমরাই শুধু এসেছি সব ঠিক হলে সবাই আসবে। আর বাসার দখল তো ছাড়ে নাই। চলতো দেখি বলে, বাড়ির ভিতরে ঢুকে লোকটাকে বলল, কি পুলিশ দিয়ে তুলিয়ে দিতে হবে নাকি? লোকটা অতি বিনীতভাবে বলল, আমরা আজই চলে যাচ্ছি। আমি আস্তে আস্তে বললাম, দাদা ঘরে কিন্তু কিচ্ছু নেই। আগেই সব সরানো হয়েছে। উকিল সাহেব বললেন, আজই যেন ঘর খালি হয় এবং এখনই। আমার জ্যাঠাত বোনের ছেলে দীপক যাকে আমরা ৫ বছর রেঁধে খাইয়েছি এবং থাকতে দিয়েছি এখন যে বিয়ে করে সংসারী হয়ে পাশের বাড়িতে ভাড়া থাকে। এ কথা শুনে ওদের বাসায় গিয়ে বললাম, আমার তো টাঙ্গাইল থাকার উপায় নেই, তোদের দুই মামাকে রেখে গেলাম। মাঝে মাঝে ওদের তরকারী রেঁধে দিস। ওরা তো রান্না করতে পারে না। আমি আবার যখন এখানে আসব তখন টাকা শোধ কর দেব। তৎক্ষণাৎ দীপক উত্তর দিল, আমরা পারব না। একটা কাজের লোক রেখে নিন।

আমি তো হা করে রইলাম। এই প্রতিদান। তখনই চলে এলাম, সেদিনই দুপুরে আমাদের দুই কাজের মাসী এসে হাজির। দাদাকে বাজারে দেখেই বুঝতে পেরেছি মা এসেছে, মা কই? আমরা বললাম, মা আসেনি বাড়িঘর ঠিক করে তারপর আনবো। ওরা কাজ করা আরম্ভ করে দিল। কল্যাণ বলল, মা আসুক, এখনই দরকার নেই। মা এলে তোমাদের খবর দিব। আমি বললাম, সন্ধ্যার মা তুমি থাকো দাদাদের রান্না-বান্না করে দিবে। সারাদিন থাকবে, ইচ্ছে হলে রাতেও থাকতে পার। এ কথা শুনে জয়রাধে রেগে অস্থির। ওকে সারা দিনরাত রাখবে আর আমাকে এক বেলার জন্যও বলল না থাক আমি থাকব না ওই থাকুক বলে রাগ করে জয় রাধে চলে গেল। বিকেলে দেখি উঠানে কি যেন খচখচ করছে, গিয়ে দেখি আমাদের পোষা কুকুরটা ফিরে এসেছে। আমাকে দেখে গা শুঁকতে শুঁকতে লেজ নাড়িয়ে কুই কুই শব্দ করছে। কাছে গিয়ে বললাম, বুঝতে পেরেছি, আমরা তোকে চিনতে পেরেছি। আজ থেকে এবাড়িতেই থাকবি এবং খাবি। রাত্রিতে খাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, পায়ের কাছে নরম ঠেকল কি দেখতে গিয়ে দেখলাম আমাদের পোষা সাদা বিড়ালটা ফিরে এসেছে। আমার পায়ের কাছে মিউ মিউ করছে আর ঘুরঘুর করে ঘুরছে। বললাম, আর মিউ মিউ করতে হবে না, মায়ার বাঁধন যখন ছিঁড়তে পারিসনি এসেই যখন পড়েছিস থাক সব হবে। বিমান, কল্যকে ভাত দিয়ে বললাম, দেখ তোরা কি মায়া। মায়ার টানে ফিরেছে তাই আজ মনে হয় গোপালের সাথে রক্তের কোন সম্পর্ক নাই বলে দিদিকে আপন ভাবতে পারেনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু এ দুইপশু যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। সামাজিক বন্ধন নেই। তারা কি করে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে আদর পেতে চাচ্ছে, খেতে চাচ্ছে। আর মানুষ হায়রে মানুষ!

২৮শ পর্ব

আমি খুব সকালে উঠে জামালপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম, এমন সময় কুমুল্লী মাসিমা এসে উপস্থিত হলো আমাকে জিজ্ঞেস করল, কোথাও যাচ্ছিস নাকি? বললাম হ্যাঁ, জামালপুর যাচ্ছি কাজে যোগদান করতে।

- কিছু খেয়েছিস?

- না, রাস্তা থেকে কিছু খেয়ে নিব।

- ঘরের লক্ষ্মী না খেয়ে বের হতে নেই। একটু অপেক্ষা কর আমি এখনই ফিরব, এই বলে উনি বের হয়ে গেলেন এবং আমার জন্য কলাপাতায় মুড়িয়ে মিষ্টি, সিঙ্গারা ও নিমকি নিয়ে এলো। আমি রসগোল্লা দিয়ে নিমকি খেতে ভালোবাসি। ওদুটো নিয়ে খেলাম তাতে মাসীমার মন ভরল না। উনি একটা সন্দেশ তুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, এটা সাথে করে নিয়ে যা রাস্তায় খাবি। আমিও তাই করলাম এবং বাকী মিষ্টিগুলো কল্যাণের হাতে দিয়ে বললাম, তোমরা খেয়ো মাসীমাকে বললাম, খুশি তো? তাইলে চলি।

- সাবধানে যেও।

আমি টাঙ্গাইল থেকে রওনা হয়ে শুনি আগের বাসটি ধনবাড়ী গিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম। ঐ বাসটিতেই তো আমি আসতাম, মাসীমা যদি আমাকে না থামাত তাহলে আমারও ঐ অবস্থা হত। এজন্যই বলে গুরুজনের কথা মানতে হয়, অবজ্ঞা করতে নেই। শুনলাম দুজন মহিলা ও এক শিশু মারা গেছে। ১০ জন আহত, আমরা যাওয়ার সময় দেখলাম বাসটি উল্টে পড়ে আছে। যথাসময়ে আমি জামালপুর পৌঁছলাম, হোস্টেলের দারোয়ান নেওয়াজ আলী আমাকে দেখে খুব খুশি হলো এবং জিনিসপত্র রেখে বলল, দিদিমনি আমি কি আপনার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করব?

- হ্যাঁ কর,

- কি করব?

- তোমার যা খুশি তাই কর।

আমি স্কুলে গিয়ে দেখি এসেম্বলি হচ্ছে, আমিও শিক্ষকদের সঙ্গে দাঁড়ালাম। এসেম্বলি শেষ হতেই বান্ধবীরা সব দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। মনি, বকুল, জাফরা, বিলকিস ওরা যেন একসঙ্গে বলতে চাইল, বেঁচে আছ তুমি। হ্যাঁ ভগবান বাঁচিয়ে রেখেছে। দপ্তরী বারেক এসে বলল, বড় আপা সবাইকে ক্লাসে যেতে বলেছে। মনোয়ারা আপা বলল, বলুক গে, একটু পরে যাচ্ছি। পারুলদি, উপাদি এসে জড়িয়ে ধরল। উপাদিকে অরুণদা কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম, ভারতীকে দেখলাম না, ঐদিন সে ছুটিতে ছিল। নতুন সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দেখলাম শিরিন আক্তার বানু। দেখতে বেশ সুন্দরী। সঙ্গে তার ছোট্ট মেয়ে নাম সোনালী।

এইতো আমার স্মৃতি, আমি নগণ্য মানুষ, আমার শুধু দুঃখ, আর ক্ষোভই রইল। পরিশেষে গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে আমার প্রিয় পাঠকদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি

যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এতদিন কাজ করেও আমি শব্দ সৈনিক বা মুক্তিযোদ্ধা হতে পারিনি। টাঙ্গাইল সময় পত্রিকা ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ডা. অরূপ রতনের লেখা এক শব্দ সৈনিকদের স্মৃতিতে-এখানে উনার খানিকটা বক্তব্য তুলে ধরছি। "মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রত্যেক শব্দ সৈনিক অস্ত্র হাতে না নিলেও তাদের কণ্ঠ, কলমের লেখনী, বুদ্ধিমত্তা আর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড দিয়ে সেই সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে দেশবাসীর মনোবলকে অটুট রেখেছেন, সাহস দিয়েছিল, উৎসাহ যুগিয়েছেন। সর্বোপরি বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

তাই জাতির জনকের কন্যা মাদার অব হিউম্যানিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব শব্দ সৈনিককে মুক্তিযোদ্ধা সম্মান দিয়েছেন, তেমনি ভাতাও দিয়েছেন এ কাজটি অতীতের কোন সরকার করতে পারেনি। এজন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সব শব্দ সৈনিকের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।" উনাদের তালিকা থেকে আমি কেমন করে বাদ পড়লাম এবং কেন বাদ পড়লাম। এ কথাটা নাট্যকার মামুনুর রশিদকে বলতে বললেন, আপনার নামতো বাদ পড়ার কথা নয়, দেখা যাক কী করা যায়। উনি এখনও দেখছেন। বাদ পড়ার কথাটা সাংবাদিক কামাল লোহানী সাহেবকেও জানিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে আমি শহিদ কল্যাণ বিহারী দাসের বড়বোন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, বর্তমানে মৃত্যুপথ যাত্রী। আমারও তো ইচ্ছে হয় আমার একটা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট থাকুক। আমার উত্তরসুরী জানুক তাদের পূর্বপুরুষ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। অরূপ রতনের বক্তব্য অনুযায়ী আমি যে এতদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করলাম, তারতো স্বীকৃতি থাকবে। কিন্তু আমি পেলাম না কেন? সেজন্য আমি বর্তমান জনদরদী বাংলাদেশ সরকারের কাছে মিনতি জানাচ্ছি, বেতার কেন্দ্রের প্রত্যেকটা শিল্পীর মত আমারটা দেরীতে হলেও যেন আমাকে একটা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বয়সে মরণপথ যাত্রীর আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূরণ হবে, এই আশা নিয়ে রইলাম। ১৯৭১ সাল যেমন বেদনাদায়ক, স্বজন হারানোর বেদনা, বিনিদ্র রজনী যাপন, কষ্ট, লাঞ্ছনা বঞ্চনার দিবস, ঠিক তেমনি ১৯৭১ সাল আনন্দদায়ক ও অফুরন্ত প্রাপ্তির দিবস, আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, আমি বিজয় দেখেছি, আমি স্বাধীনতা দেখেছি। তাই আমি সৌভাগ্যবতী। হাজারো ত্যাগ তিতিক্ষার পর এ বিজয় আমাদের অহংকারের, এ বিজয় আমাদের গৌরবের। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর আমাদের এ রক্তঝরা বিজয় বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে চাই:

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।